সম্পূর্ণ উপন্যাস

দুঃস্বপ্ন বারবার

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই স্কুলব্যাগ থেকে প্লাস্টিকের বাক্সটা বের করল টুপুর। ক্লাসরুমে আহার ব্যাপারটা টুপুরের না-পসন্দ, সোজা গিয়ে বসেছে কম্পাউন্ডের ছাতিম গাছের নীচের বেদিটায়। সেই কোন সোয়া ন'টায় বেরিয়েছে, এখন ঘড়ির কাঁটায় দুটো পার। বহুৎ চোঁ-চোঁ করছে পেট, এক্ষুনি চিলচিৎকার জুড়বে নাড়িভুঁড়ি। থুড়ি ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র, পাকস্থলি, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি-ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, এইভাবেই ভাবতে বলে মিতিনমাসি। এতে নাকি চিন্তাভাবনায় বেশ একটা গোছানো ভাব আসে। কথাটা মনে আসতেই টুপুর সামান্য উদাস। কতদিন দেখা হচ্ছে না মাসির সঙ্গে। সেই গরমের ছুটিতে মাত্র সাতদিনের জন্য গিয়েছিল টুপুর, ব্যস। এমনই পোড়া কপাল টুপুরের, ঠিক তখনই জ্বরে পড়ল মাসি। ব্যস, বেড়াতে যাওয়া চুলোয়, কোনও কেসটেসও এল না, দিনগুলো পুরো বৃথাই গেল টুপুরের। আজকাল তো টুপুরকে ফোন পর্যন্ত করতে পারছে না মাসি। কে জানে, মাসি হয়তো টুপুরকে আর পাত্তাই দিতে রাজি নয়। গোয়েন্দাগিরিতে মাসির সহকারী হওয়ার স্বপ্নটাও বুঝি অপূর্ণই রয়ে গেল এজন্মে।

ঈষৎ বেজার মুখে টুপুর পাত্রটা খুলল। খাবার দেখে আরও খিঁচড়ে গেল মেজাজ। উফ্‌ফ, আজ আবার চাউমিন। তাও হয়তো গিলে নেওয়া যেত, কিন্তু এমন গাদাখানেক সস ছড়িয়েছে মা প্রাণের সুখে! ওই দ্রব্যটি মুখে তুললে ওয়াক না উঠে আসে!

দ্রুত একটা মতলব এঁটে নিল টুপুর। ক্লাসের অনেকেই তো তোলাতোলা করে খায় চাউমিন, তাদের কাউকে গছিয়ে দিতে পারলেই তো ল্যাঠা চোকে, বিনিময়ে তার খাবারটাই নয় সাঁটাবে আজ।

কাকে ধরা যায়? টুপুর তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। জয়, নেহাল, তরান্নুমলদের দলটা টিফিন বদলাবদলি করেই খায়, সুতরাং, ওখানে ভেড়া যাবে না। শৌভিক তো নির্ঘাৎ টোস্ট এনেছে, শুকনো-শুকনো ওই দ্রব্যটিও টুপুরের দু'চক্ষের বিষ। ওপাশে রিয়া, মণিকা, দেবারতিদের দঙ্গলটায় উঁকি দিয়ে দেখবে? বড্ড বেশি সাজগোজের গল্প করে ওরা, টুপুর পছন্দ করে না খুব একটা, তবু আজ না হয়...

আচমকা চোখ আটকেছে শালিনীতে। সামনে খোলা টিফিনকৌটো,

ছবি:অমিতাভ চন্দ্র

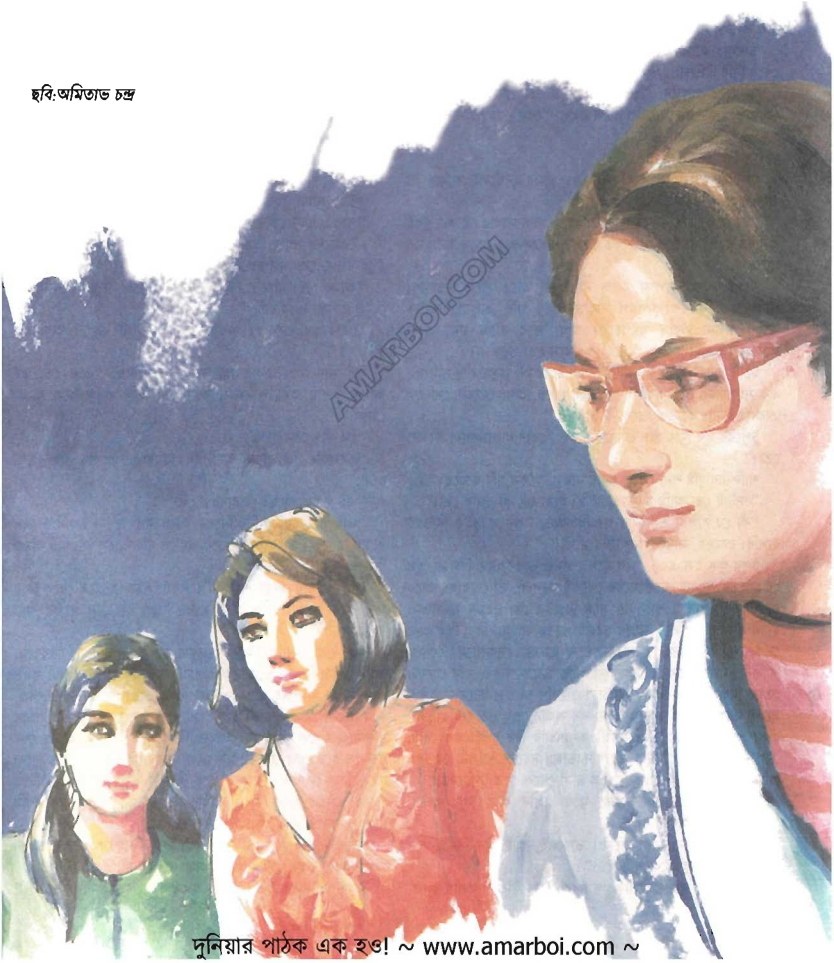

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটা কেমন ড্যাবলার মতো বসে! হাত নড়ছে না, মুখ নড়ছে না, চারদিকের হট্টগোলে দৃষ্টি নেই। হলটা কী? খাবার পছন্দ নয়? কিন্তু শালিনী ঘোরতর নিরামিষাশী, ডিম, পেঁয়াজ, রসুন কিচ্ছুটি ছোঁয় না, ও কি খাবার বিনিময়ে রাজি হবে?

তবু খিদে বড় বালাই। পায়ে-পায়ে শালিনীর কাছে গেল টুপুর। পিছন থেকে ঘাড়ের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, "তোর কী মেনু রে আজ?"

"পুরি, হালুয়া, আঙ্গুর আর মুগডালের ভুজিয়া।"

আইব্বাস, সবক'টাই তো টুপুরের প্রিয় আইটেম! আর শালিনীর বাড়ির পুরি-হালুয়ার টেস্টও আলাদা। খাঁটি ঘিয়ে ভাজা বলে ভারী চমৎকার একটা বাসও বেরোয়! একদিন খাইয়েছিল শালিনী, সাতদিন স্বাদটা লেগে ছিল জিভে!

কিন্তু কীভাবে আজ কথাটা পাড়ে টুপুর? সরাসরি খেতে চাইবে, নাকি কায়দা করে বলবে একটু টেস্ট করা তো? খাবলা মেরে তুলেও নেওয়া যায় খানিকটা। খুব ঠান্ডা মেয়ে শালিনী, রাগও করবে না, মুখে রাও কাড়বে না সম্ভবত, কিন্তু মনে-মনে বিরক্ত তো হবে নিশ্চয়ই।

ভাবনার মাঝে আচমকা শালিনীর গলা, "তুই আমার টিফিনটা খেয়ে নিবি ঐন্দ্রিলা, প্লিজ?"

অভাবিত প্রস্তাবে ঐন্দ্রিলা তথা টুপুর তো প্রায় বিষম খাওয়ার জোগাড়! কোনওক্রমে ঢোক গিলে বলল, "কেন রে, তুই খাবি না?"

"ইচ্ছে করছে না রে।"

"শরীর ভাল নেই বুঝি?"

"শরীর, মন কিচ্ছু ভাল নেই রে। খাবার দেখলেই আমার গা গুলোচ্ছে।"

"তা হলে তো চেষ্টা করে দেখতেই হয়। খাবারদাবার নষ্ট করা খুবই অনুচিত কাজ, নয় কি? বিশেষত যে দেশে লক্ষ-লক্ষ মানুষ অনাহারে থাকে?"

বলেই আর অপেক্ষা করল না টুপুর, হাতে তুলে নিয়েছিল শালিনীর টিফিনবক্স। গপগপ সাবাড় করছে পুরি, হালুয়া, টকাটক আঙুর চালান করছে মুখগহ্বরে। আহ, ভরে যাচ্ছে মন। এমন মনোহারী হালুয়া আগে খেয়েছে কি? মনে তো পড়ে না।

হঠাৎ হোঁচট খেল। শালিনীর আচরণটা কেমন অদ্ভুত না? সামনেই এক সহপাঠিনী তার খাবারটা গোগ্রাসে খাচ্ছে, অথচ মেয়েটা সেদিকে তাকাচ্ছেই না! কী এত ভাবে বিভোর?

টুপুরের মুখ দিয়ে প্রশ্ন বেরিয়ে গেল, "তোর ব্যাপারখানা কী বল তো?"

শালিনীর দৃষ্টি শূন্য থেকে ধরায় নামল, "কেন, কী হয়েছে?"

"সেটাই তো আমি জানতে চাইছি। হয়েছেটা কী বলবি তো।"

"কী যে বলি," শালিনীর স্বর দ্বিধান্বিত, "শুনলে তুইও নিশ্চয়ই হাসবি। রণদেব, জয়িতা, নিশাদের মতো।"

টুপুর ক্ষুব্ধ হল একটু, তবে মুখে কোনও ভাব ফুটতে দিল না। সে যে ক্লাসের অনেক ছেলেমেয়ের থেকেই আলাদা, তা বোধ হয় জানে না শালিনী। অবশ্য শালিনীর সঙ্গে টুপুরের তো তেমন ঘনিষ্ঠতাও হয়নি এখনও। শালিনী তাদের স্কুলেই পড়ছে বরাবর, কিন্তু ছিল অন্য সেকশনে, এ বছরই ক্লাস সেভেনে তাদের সেকশনে এসেছে শালিনী। মাত্র কয়েক মাসেই বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারত, যদি মেয়েটা তেমন মিশুকে হত। কিন্তু মেয়েটা বড্ড বেশি চুপচাপ ধরনের। কারও সঙ্গেই দরকার ছাড়া কথা বলে না খুব একটা, শুধু ওই হাই হ্যালো, ব্যস। এবছর স্কুলের রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানের দিন পেঁয়াজের ছোঁয়া খেল না বলে নজরে পড়ল ওর খাদ্যাভ্যাস, নয়তো শালিনী যে চরম গোড়া নিরামিষাশী, তাও হয়তো অজানা থেকে যেত টুপুরদের।

একমুঠো মুগডালের ভুজিয়া মুখে চালান করে টুপুর বলল, "কথাটা নিশ্চয়ই মজার নয়?"

"একেবারেই না। বরং ভয়ের। ভাবলেই, আই মিন সিনটা মনে পড়লেই আমার বুক কেঁপে উঠছে।"

টুপুর যেন হালকা রহস্যের গন্ধ পেল। ঈষৎ উদগ্রীব গলায় বলল, "কী কথা? কী এমন দৃশ্য? কোথায় দেখেছিস?"

"স্বপ্নে।"

"মানে?" টুপুরের আচমকা হাসি পেয়ে গেল। কোনওমতে গিলে নিয়ে বলল, "স্বপ্ন দেখে কেউ ভয় পায় নাকি?"

"আমিও পাই না, কিন্তু অবিকল একই স্বপ্ন কেউ যদি দিনের পর-দিন দেখে, আর সেই স্বপ্নটা যদি ভয়ঙ্কর হয়।"

"দাঁড়া-দাঁড়া, রোজ তুই সেম স্বপ্ন দেখিস?"

"গত চারদিন তো দেখছি।"

"স্বপ্নটা কী? বলতে আপত্তি নেই নিশ্চয়ই? হাসব না, ওয়ার্ড অব অনার।"

তবু যেন ভরসা পাচ্ছে না শালিনী, নখ খুঁটছে নত মুখে। টুপুরের কপালে ভাঁজ বাড়ল। নাহ, সমস্যাটা গভীরই মনে হচ্ছে। মিতিনমাসির পরামর্শটা মনে পড়ল টুপুরের। যখন কেউ সঙ্কোচের কারণে কোনও কিছু বলতে কুণ্ঠা বোধ করে, তখন বেশি জোরাজুরি করতে নেই, বরং প্রশ্ন বদলে ফেলে তাকে সহজ করে নেওয়া অনেক জরুরি।

টুপুর প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলল, "হ্যাঁরে শালিনী, তোদের বাড়িতে সব্বাই ভেজিটেরিয়ান?"

শালিনী অল্প মাথা নাড়ল, "হুঁ।"

"কেউ কখনও আমিষ খায় না?"

"খেতে পারবেই না।"

"কেন?"

"ধর্মে নিষেধ আছে যে।"

"তোরা বুঝি বৈষ্ণব?"

"উঁহু, আমরা জৈন।"

টুপুরের একটু কৌতূহল জাগল। জৈনধর্ম ইতিহাসে পড়েছে বটে, কিন্তু জৈনদের সম্বন্ধে তার তেমন ধারণা নেই। সামান্য আগ্রহী স্বরে টুপুর বলল, "বাঙালিদের মধ্যে জৈন আছে নাকি?"

"আমরা তো বাঙালি নই। রাজস্থানি। আরও ঠিক ভাবে বলতে গেলে আমরা মারোয়াড়ি।"

"তোর কথা শুনে তো একটুও বোঝা যায় না। একটুও অবাঙালি টান নেই।"

শালিনীর মুখে এবার পাতলা হাসি ফুটেছে, "তাও তো তুই আমার বাবার কথা শুনিসনি। বাবা তো হিন্দি পর্যন্ত বলে বাংলা টোনে।"

"সে কী? কেন?"

"অনেকদিন এ রাজ্যে আছি যে আমরা। বোধ হয় এক-দু'শো বছর।"

"এই কলকাতাতেই? বরাবর?"

"তাই তো জানি। বিকানিরের কাছে নাগৌর না কোথায় যেন আমাদের দেশ। তা আমি সেখানে কখনও যাইনি, সে জায়গার নামও ঠিক জানি না।"

"ও," কথায়-কথায় শালিনী খানিকটা সহজ হয়েছে দেখে টুপুর ফস করে পুরনো প্রশ্নে ফিরে গেল, "তুই কী যেন স্বপ্নের কথা বলছিলি না?"

"হ্যাঁ তো," শালিনী মাথা দোলাল, "পর-পর চাররাত দেখলাম। আমি একটা বিশাল ঘরে ঢুকেছি, ঘরটা এত উঁচু যে, সিলিংটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। সেই ঘরে একটা লোক দাঁড়িয়ে। লোকটা কী প্রকাণ্ড, যেন একটা মিনি পাহাড়। ইয়া মোটা গোঁফ আছে লোকটার, চোখ দু'খানাও জাম্বো সাইজের। আমার দিকে দৃষ্টি পড়তেই আরও যেন বড়-বড় হয়ে গেল চোখের মণিগুলো। আমাকে এক হ্যাঁচকায় শূন্যে তুলে নিল লোকটা, তারপর ছুড়ে দিল সিলিংয়ের দিকে। মাটিতে পড়ার আগেই লুফে নিল। আবার ছুড়ছে, আবার লুফছে। আমি চিৎকার করছি, কিন্তু গলায় কোনও স্বর নেই..."

সত্যিই তো, খুব অস্বস্তিকর স্বপ্ন। টুপুর নিজেকে ওরকম একটা দৃশ্যে কল্পনা করল। উঁহু, মোটেই মজা লাগছে না।

টুপুর গম্ভীরমুখে বলল, "তখনই তোর ঘুম ভেঙে যায় নিশ্চয়ই।"

"তা হলে তো বেঁচে যেতাম। কিন্তু স্বপ্নটা আরও অনেক লম্বা। ওই লোকটা আমাকে এক হাতে ঝুলিয়ে ঘরে পাক খায়। তারপর দেওয়ালের ধারে গিয়ে আর-একটা লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল..."

"যা বাব্বা, দ্বিতীয় একজন? সে এল কোত্থেকে?"

"কী জানি। সে লোকটা দেওয়ালে ঝোলে। ওই লোকটার বডি থেকে একটা লাঠি বের করে আনে, হঠাৎই লাঠিটা খুলে যায়, আর লাঠিটা হয়ে যায় দেওয়াল।"

"তা কী করে সম্ভব?"

"কিন্তু সেটাই তো হচ্ছে। আমি তো তাই দেখছি," শলিনীর নাকের পাটা ফুলছে উত্তেজনায়, "এর পর যা ঘটে সে তো আরও ভয়ঙ্কর। লোকটা দেওয়ালে লাথি মারে, অমনি কানে তালা লাগা আওয়াজ। আর দেওয়াল ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। সেই গর্তে আমাকে ফেলে দিল... আমি অন্ধকারে পড়ছি, পড়ছি...তখনই আমার ঘুমটা ভেঙে যায়। আমি দরদর করে ঘামতে থাকি। বাকি রাতটা আমি আর ঘুমোতে পারি না। সারাদিন স্বপ্নটা চোখে লেগে থাকে, আমার গা শিউরনো ভাবটা কিছুতেই কাটতে চায় না।"

"খুবই বিশ্রী ব্যাপার তো," টুপুর ঠোঁট চাপল, "অবিকল এই স্বপ্ন দেখছিস রোজ?"

"একেবারে সিন টু সিন," শালিনীর মুখ কাঁদো-কাঁদো, "আমার তো এক-এক সময় মনে হচ্ছে, আমি পাগল হয়ে যাব।"

কী বলে মেয়েটাকে আশ্বস্ত করবে, ভেবে পেল না টুপুর। স্বপ্নকে আদৌ আমল দেওয়া উচিত কি? মনগড়া ব্যাপারস্যাপার থেকেই তো স্বপ্ন তার ডানা মেলে। কেউ-কেউ অবশ্য বলে বটে ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়। তা শালিনী তো স্বপ্ন দেখছে মাঝরাতে। সুতরাং স্বপ্নটাকে স্বচ্ছন্দে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া যায়। কিন্তু কোথায় যেন খচখচ করছে। কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারছে না কেন? টুপুরও কি স্বপ্নটাকে বিভীষিকাময় কিছু একটা ভেবে নিল?

ফের শালিনীর গলা বাজছে। একটু যেন বাঁকা সুরেই বলল, "কীরে, শুনেই নার্ভাস হয়ে গেলি?"

"না-না স্বপ্নটা বোঝার চেষ্টা করছি," টুপুর একটু কায়দা করে গলা ঝাড়ল, "তুই কি রিসেন্টলি কোনও ভয়ের সিনেমা দেখেছিস?"

"মোটেই না। আমি হরর মুভি দেখিই না।"

"তা হলে নির্ঘাৎ ঘোস্ট স্টোরি পড়েছিস? এবং বইয়ের পাতার ভূত তোর মগজে সেঁধিয়ে গিয়ে রোজ রাত্রে তোর ঘুমটাকে ডিস্টার্ব করছে।"

"অসম্ভব। আমি ভূতের গল্প, রহস্য গল্প সেই কবে থেকে পড়ছি, কখনও এরকম হয়নি তো।"

"আগে কিছু হয়নি বলে কোনওদিন কিছু হবে না, এটা ধরে নেওয়া বোধ হয় ঠিক নয়।"

টুপুর বলল বটে, তবে নিজের কথা নিজের কানেই বড় ফাঁপা ঠেকল যেন। কপাল ভাল, টিফিন শেষের ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে। শালিনীকে ফেলে রেখেই ক্লাসের দিকে দৌড়ল টুপুর। অঙ্ক, ভূগোল, ইংরেজি একটি ক্লাসেও পড়ায় মন দিতে পারল না, শালিনীর বিদঘুটে স্বপ্নটাই দখল করেছে মস্তিষ্ক। কিছু যেন একটা অর্থ আছে, কিন্তু ধরা যাচ্ছে না। এক স্বপ্ন বারবার ঘুরে আসছে, এটাও তো অস্বাভাবিক। বাড়িতে স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার একটা বই আছে, দেখেছে টুপুর। স্কুল থেকে ফিরেই বসে যাবে বইটা নিয়ে? নাকি অভিমান ভুলে একটা ফোন করবে মাসিকে?

কাল একটা কিছু জবাব তো দিতেই হবে শালিনীকে, নয় কি?

॥ ২ ॥

বাড়িতে ঢুকেই তো টুপুরের ভিরমি খাওয়ার দশা। মিতিনমাসি এসেছে আজ, সঙ্গে পার্থমেসোও হাজির। এ যে মেঘ না চাইতেই জল।

খাতা বইয়ের ব্যাগ ঘরে ছুড়ে দিয়েই লাফাতে-লাফাতে ফিরল টুপুর। মাসি আজকাল খোঁজ রাখছে না টুপুরের, সেই অভিমান ধুয়েমুছে সাফ। মাসির গা ঘেঁষে টুপুর বসেছে সোফায়, আহ্লাদী সুরে বলল, "তোমরা কতক্ষণ?"

মেসোই উত্তর দিল, "চারটের মধ্যেই ঢুকে যেতাম রে। নিরঞ্জনের মাংসের চপটা নিতে গিয়ে খানিক লেট হয়ে গেল।"

"শুধু চপ নাকি? আরও কত কী এনেছে। সন্দেশ, চমচম, সঙ্গে ডিমের ডেভিল," সহেলির গলায় ছদ্মবিরক্তি, "এই পাহাড়প্রমাণ খাবার কে খাবে? টুপুরের বাবা তো ভাজাভুজি আজকাল ছুঁয়েও দেখে না..."

"কিচ্ছু চিন্তা করিস না দিদি," এবার মিতিনের স্বর ফুটেছে, ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "যে এনেছে, সে কি তোরা শেষ করবি তার তোয়াক্কা করে? একাই চপ-ডেভিলের শ্রাদ্ধ করবে এখন। তুই শুধু বসে-বসে দেখে যা।"

"এই আওয়াজ মেরো না তো," পার্থ মুচকি হাসল, "উত্তর কলকাতায় এলে এগুলো না খেয়ে ফেরে কোন বুরবক? আমাদের সাউথ কলকাতায় থোড়াই এসব সুখাদ্য মেলে।"

"তো আমাদের ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাটটা তা হলে বেচে দিই?" মিতিন চোখ টিপল টুপুরকে। ঘুরে পার্থকে বলল, "হাতিবাগান, শ্যামবাজার, বাগবাজার কিংবা ধরো বেলগাছিয়া-পাইকপাড়ার দিকটায় চলে আসি, কী বলো?"

"যাহ, তাই হয় নাকি? আমাদের বন্ধুবান্ধব, চেনাজানা সব্বাই তো সাউথেই থাকে, হুট করে তাদের ছেড়ে আসা যায় নাকি?"

"আসল কথাটা বলো না," মিতিন ফিকফিক করে হাসছে, "নর্থের ভিড়ভাট্টা তোমার পোষায় না। কিন্তু জিভটা তোমার উত্তরের খাবারের লোভে সদাই ললকল করে।"

"কী অপমানজনক মন্তব্য!" বিটকেল একটা ভ্রূকুটি করল পার্থ। পরক্ষণেই অম্লানবদনে বলল, "আমি অবশ্য গায়ে মাখছি না। কারণ, যেখানকার যেটা ভাল, সেটা গ্রহণ করতে কোনও দ্বিধা নেই। এটা তো মানতেই হবে কাটলেট, ডেভিল, চপ, কবিরাজি বানানোয় উত্তর কলকাতার একটা দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। এক-একটা দোকানের বয়স একশো- সোয়াশো বছর। এতদিন ধরে তারা নানান পরীক্ষানিরীক্ষা করে একটা নিজস্ব গুণমান তৈরি করেছে। আমি তাদের সেই গুণটার কদর করছি মাত্র।"

"বেশি জ্ঞান মেরো না তো," মিতিন হালকা ধমক দিল পার্থকে। ঘুরে টুপুরের মাকে বলল, "চটপট ওকে থালা সাজিয়ে দে। নয়তো ও ভাট বকেই যাবে।"

সহেলি হাসতে-হাসতে চলে গেল রান্নাঘরে। সত্যিই দু'খানা প্লেট-বোঝাই চপ, ডেভিল, মিষ্টি এনে রাখল সেন্টার টেবিলে। সঙ্গে পেঁয়াজ, শশা, বিট আর মাস্টার্ড সস। 'খাও' শব্দটুকু শোনার তর সইল না পার্থর। হলুদ, ঝাঁঝালো সসে চপ ডুবিয়ে পেল্লাই কামড় বসাল একখানা। পরক্ষণে চোখ দু'খানা বুজে গেল। যেন এক স্বর্গীয় অনুভূতি জেগেছে। মুখ নাড়ছে অল্প-অল্প, জিভ যেন চপের পুরের প্রতিটা কণার স্বাদ নিচ্ছে তারিয়ে-তারিয়ে।

টুপুর হেসে ফেলল। ওহ, পেটুক বটে পার্থমেসো। মাসি বলে, মানুষ খাওয়ার জন্য বাঁচে না, বাঁচার জন্য খায়। কিন্তু পার্থমেসোর খাওয়ার ভঙ্গিমাটি দেখলে মনে হয়, মানুষের বেঁচে থাকার সার্থকতা বোধ হয় শুধু ভোজনেই।

পার্থ ভুরু নাচিয়ে টুপুরকে বলল, "কীরে তোল কিছু। আমার একা-একা খেতে লজ্জা করছে যে।"

টুপুর একখানা ডেভিল নিল প্লেট থেকে। নিরঞ্জন দোকানটা বানায় সলিড, আস্ত ডিম পোরা থাকে, গোটা একখানা ডেভিল খেলে পেট জয়ঢাক অনিবার্য। আধখানা ভেঙে পুরল মুখে, দু'আঙুলে মুদ্রা ফোটাল তারিফের। ঘাড় হেলিয়ে মিতিনমাসিকে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা নিশ্চয়ই কেবল খাবার কিনতেই আজ পেট্রল পুড়িয়ে এত দূর আসোনি?"

মিতিন ব্যঙ্গের সুরে বলল, "তোর তো দারুণ অবজার্ভেশন। তা হলে এবার বের করে ফ্যাল, কেন এসেছি?"

টুপুর বলল, "নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও তোমার কোনও ক্লায়েন্ট আছে? তাকে মিট করে তুমি এখানে..."

"নো, সেনোরিটা, ইউ আর রং। আমরা তোমাদের বাড়িতেই এসেছি। কারণটা ক্রমশ প্রকাশ্য। তার আগে বল তোর স্কুল কেমন চলছে?"

"সো-সো। তবে আজ একটা..." টুপুর থমকাল একটু। শালিনীর প্রসঙ্গটা তুলবে কি এখন? সামান্য দোনামোনা করে বলল, "স্কুলে আজ একটা আজব ঘটনা শুনলাম। একবার মনে হচ্ছে হাস্যকর, আবার কখনও মনে হচ্ছে ব্যাপারটায় একটা রহস্যের ইঙ্গিত থাকলেও থাকতে পারে..."

"তোকেও কি মাসির রোগে ধরল?" পার্থ দ্বিতীয় চপ তুলল। তেরচা হেসে বলল, "তুই কি স্কুল থেকেই টিকটিকিগিরি ধরবি প্ল্যান আঁটছিস?"

টুপুর মিইয়ে গেল। ঢোক গিলে বলল, "না মানে... আমার এক ক্লাসমেট..."

"খুব বিপদে পড়েছে তো?" পার্থর হাসি চওড়া হল, "ওরে বুদ্ধু, বিপদ মানেই রহস্য নয়। আর অন্যের বিপদের সমাধান করার জন্য তুই স্কুলে যাস না, তুই যাস লেখাপড়া করতে।"

"তাই বলে বন্ধুকে হেল্প করব না?"

"সে তুই নোট দিয়ে হেল্প কর। বই দিয়ে সাহায্য কর। কাল্পনিক রহস্যের গন্ধ খুঁজে কেন সময়টা বরবাদ করবি?"

"আমিও তো সর্বদা সেই উপদেশই দিই, গ্রাহ্য করে মেয়ে?" এবার সহেলির গলা আছড়ে পড়ল, "স্কুলে গিয়েও তিনি সারাক্ষণ গেছোমি করছেন। কোথায় কে কার সঙ্গে মিসবিহেভ করল, উনি চললেন তাকে শাসাতে। স্কুলের পেয়ারা গাছে কে পেয়ারা পাড়তে উঠবে? আর কে? ঐন্দ্রিলা। গত সপ্তাহে কতটা হাঁটু ছড়ে স্কুল থেকে ফিরেছিল, তোমরা যদি দেখতে? ওদিকে ক্লাসটেস্টের নম্বর দ্যাখ? কোনওটায় ফর্টি পারসেন্ট, কোনওটায় ফিফটি। সায়েন্সে কুড়িতে মাত্র তেরো পেয়েছে, ভাবতে পারিস?"

"আহ দিদি, ওর পিছনে ট্যাকট্যাক করিস না তো। ক্লাসটেস্টে যেমনই হোক, ফাইনাল এগজ্যামে ও ঠিক ম্যানেজ করে নেবে। আফটার অল, ব্রেনটা তো টুপুরের খারাপ নয়। একটুআধটু দস্যিপনা না করলে ও লেবদুস বনে যাবে।"

"তুই ওকে আর তোল্লাই দিস না তো। এই আমি সাফ জানিয়ে রাখছি, যদি অ্যানুয়ালে ও ধ্যাড়ায়, মানে প্রথম তিনজনের মধ্যে না আসতে পারে, তা হলে তোমার সঙ্গে ল্যাংবোট হয়ে ঘোরা ওর খতম। শত কাকুতিমিনতি করলেও ওকে আমি ছাড়ব না।"

"আচ্ছা বাবা আচ্ছা, তাই হবে," দিদির শাসানির বহরে যেন ভারী মজা পেয়েছে মিতিন। দু'হাত তুলে সহেলিকে থামিয়ে টুপুরকে গলা নামিয়ে বলল, "কী হয়েছে স্কুলে?"

মাকে চোরা চোখে দেখে নিয়ে টুপুর উগরে দিল শালিনীর স্বপ্ন উপাখ্যান। মাঝে-মাঝে প্রশ্ন করে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জেনে নিল মিতিন। একটু চুপ থেকে বলল, "কী যেন নাম বললি মারোয়াড়ি মেয়েটির?"

"শালিনী। শালিনী শেঠ।"

"শেঠ তো উপাধি। আসল পদবি কী?"

"মানে?"

"আশ্চর্য, এটাও বুঝলি না! শেঠ উপাধিটা ওঁরা কোনও সূত্রে পেয়েছেন। কিন্তু ওঁদের তো একটা বংশগত সারনেম থাকার কথা।"

"আছে হয়তো, জানা হয়নি।"

"ভেরি ব্যাড। তথ্য যখন নিবি, ডিটেলে কালেক্ট করবি।"

ধমক খেয়ে দমল না টুপুর। জোর গলায় বলল, "সবই জোগাড় করেছি। শুধু ওই ছোট্ট পয়েন্টখানা মিস করে গিয়েছি।"

"বটে। কী-কী পেয়েছিস তা হলে বল।"

"যেমন ধরো, শালিনীর বাবার নাম আকাশচাঁদ, মায়ের নাম গৌরী।"

"অপ্রয়োজনীয় তথ্য। আর?"

"শালিনীর কোনও ভাইবোন নেই। ওর ঠাকুরদা, ঠাকুরমাও বেঁচে নেই। ঠাকুরমাকে ও চোখেই দেখেনি। ঠাকুরদাও মারা গিয়েছেন খুব ছেলেবেলায়, তাঁকেও ওর মনে নেই। আগে ওরা থাকত নর্থ ক্যালকাটায়, মানিকতলার কাছে। ঠাকুরদার মৃত্যুর পর-পরই শালিনীর বাবা উঠে এসেছিলেন দক্ষিণ কলকাতায়। এখন ওরা থাকে ঢাকুরিয়া লেকের ধারে, একটা চোদ্দোতলা বাড়ির টেন্‌থ ফ্লোরে। শালিনীর জ্যাঠা এখনও সেই মানিকতলার বাড়িতেই বাস করছেন।"

"অর্থাৎ দুই ভাই আলাদা হয়ে গিয়েছেন?"

"অনেকদিন।"

"হুম। তারপর?... কী করেন শালিনীর বাবা?"

"সফটওয়্যারের ব্যবসা। ওদের বাড়ির কাছেই। খুব রমরমা কারবার।"

"স্বপ্নটার কথা ও বাবা-মাকে বলেছে?"

"হ্যাঁ, তাঁরা নাকি খুব একটা পাত্তা দেননি।"

"তোরাই বা মাথা ঘামাচ্ছিস কেন?" খাওয়া থামিয়ে চোখ গোলগোল করে মাসি-বোনঝির বাক্যালাপ গিলছিল পার্থ, একটু সুযোগ মিলতেই নাক গলিয়ে দিয়েছে তৎক্ষণাৎ, "কেন যে রোজ একই অদ্ভুতুড়ে স্বপ্ন দেখছে, সেটার জন্যও কি গোয়েন্দাগিরি করতে হবে?"

"যে-কোনও অস্বাভাবিক ঘটনার পিছনে একটা কিছু কারণ থাকে," মিতিন ঠান্ডা গলায় বলল, "আর গোয়েন্দার দায়িত্ব সেই লুকনো কারণটা খোঁজা।"

"আরে, এখানে তো কিছুই ঘটেনি।"

"একই স্বপ্ন বারবার দেখাটাও একটা বিশেষ ঘটনা বই কী," মিতিন নিজের মতে অনড়। দৃঢ় স্বরে বলল, "স্বপ্ন আশমান থেকে টপকায় না স্যার। আমাদের নিত্যদিনের নানান ঘটনাই রূপ বদলে রাতের স্বপ্নে হানা দেয়। কখনও বা অবিকৃত চেহারাতেও আসে। কিন্তু প্রতি রাতে একভাবে ফিরে-ফিরে আসাটা অবশ্যই স্পেশাল মনোযোগ দাবি করে। হয়তো স্বপ্নটার মধ্যে লুকিয়ে আছে কোনও আসন্ন বিপদের সংকেত। শালিনী মেয়েটা মনে-মনে হয়তো..."

"ধুৎ, স্বপ্ন কি সর্বদা নিয়ম মেনে হয় নাকি? কত তুচ্ছ ব্যাপার থেকেও তো স্বপ্নের জন্ম হয়। স্বপ্ন তো অবচেতন মনের একটা মিস্ক্সচার। হয়তো মেয়েটা পথেঘাটে একটা ভয় পাওয়ানো গোছের সামথিং দেখেছিল, মে বি কোনও কাপালিক বা তান্ত্রিক। তার ভাটার মতো চোখ কিংবা চুল ওর মধ্যে একটা আতঙ্ক তৈরি করেছিল। তারই একটা ভাঙাচোরা চেহারা ওই স্বপ্নটার মধ্যে এসে হাজির হয়েছে।"

"হতেও পারে। কিন্তু কোনও অনুমানের মধ্যে তো ছেড়ে দিতে পারি না। সুতরাং স্বপ্নটার কার্যকারণ সূত্র মানছে কিনা সেটাও তো বাজিয়ে দেখতে হবে।"

"আমার ঘাট হয়েছে। আমাকে ক্ষ্যামা দাও," মজারু ভঙ্গিতে হাতজোড় করল পার্থ, "তোমাদের যা প্রাণ চায় করো, কিন্তু দরকারি কাজটা আগে সেরে নাও। নয়তো যে উদ্দেশ্যে আসা, সেটাই হয়তো ভুলে যাব।"

মিতিন কাঁধ ঝাঁকাল, "তুমিই বলো না।"

"ওকে," পার্থ ডেভিলের শেষটুকু চালান করে দিল মুখগহ্বরে। সহেলি চা এনেছে, পেয়ালা-পিরিচ হাতে তুলে নিয়ে বলল, "সহেলিদি, পুজোয় এবার স্পেশাল কোনও প্রোগ্রাম আছে নাকি আপনাদের?"

সহেলি জোরে-জোরে মাথা নাড়ল, "কই না তো। ওই কয়েকটা মণ্ডপে ঘোরা, আর বড়জোর এক-আধদিন কোনও ভাল রেস্তরাঁতে যাওয়া। তাও যদি টুপুরের গেঁতো বাবাটিকে নাড়াতে পারি। তিনি নির্ঘাৎ ওই সময়টিতেই ভারী-ভারী কেতাব খুলে বসার মতলব আঁটবেন।"

টুপুরের বাবা অবনী কলেজে পড়ান। তাঁর দু'টিই নেশা। দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধের বই গেলা ও ঘুম। পুজোর ছুটিতে দুটোই যে তিনি পুরোমাত্রায় উপভোগ করতে চাইবেন, এ তো বলাই বাহুল্য।

পার্থ চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, "এবার যদি অবনীদার সুখে ব্যাঘাত ঘটাই?"

"কীভাবে?"

"রাজস্থানে যদি একটা ট্রিপ করি?"

"ও মা, রাজস্থান তো আমার স্বপ্ন!" সহেলি আহ্লাদে লাফিয়ে উঠল, "কবে বেরব? ক'দিনের জন্য যাব? কোথায়-কোথায় ঘুরব?"

"ধীরে-ধীরে। একে-একে বলি তা হলে," মিতিনকে ঝলক দেখে নিয়ে পার্থ গলা ঝাড়ল, "লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন বিকেলে যাত্রা শুরু। প্রথমে দুরন্ত এক্সপ্রেসে নয়া দিল্লি। সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে জয়পুর। কোজাগরী পূর্ণিমার চাঁদটা আমরা জয়পুরেই দেখব। তারপর যাব আজমেঢ়, পুষ্কর, যোধপুর, বিকানির, জয়সলমীর হয়ে মাউন্ট আবু। দেন উদয়পুর টক্স অ্যান্ড চিতোরগড়। দুর্গ দেখার মাঝে টুক করে একটু জঙ্গল সাফারি। রণথম্ভোর ফরেস্ট। অবশেষে ভরতপুর পাখিরালয় ছুঁয়ে ব্যাক টু নিউ দিল্লি এবং রাজধানীতে চড়ে প্রত্যাবর্তন। মোট আঠারো দিন।"

টুপুরের উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন। নাচতে ইচ্ছে করছিল টুপুরের। কল্পচক্ষে দেখতে পাচ্ছে দুর্গ, মরুভূমির উটের পাল। সোনালি বালি। রঙিন পাগড়ি পরা তাগড়াই লোকজন।

আচমকা মিতিনমাসির গলা, "শালিনীকে একটা কথা জিজ্ঞেস করিস তো। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বাড়িতে নতুন কেউ এসেছে কিনা।"

আজব কৌতূহল তো! স্বপ্নটা তা হলে টানছে মাসিকে। কিন্তু কেন?

॥ ৩ ॥

পরদিন স্কুলে গিয়ে টুপুরের আক্কেল গুড়ুম। শালিনী যেন আচমকাই বদলে গিয়েছে। কাল তো মেয়েটার সঙ্গে দিব্যি পটে গিয়েছিল টুপুরের। টিফিনের পর ক্লাসেও কথা বলছিল টুকটাক, ছুটির পরও কত গল্প করল...ই-মেল আইডি, মোবাইল নম্বর আদানপ্রদান সবই হল হাসিমুখে। কিন্তু আজ যেন টুপুরকে চিনতেই পারছে না শালিনী। নাকি চিনতে চাইছে না? চোখে চোখ পড়লে দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছে। যেচে কথা বলা তো দূরস্থান, প্রশ্ন করলেও এড়িয়ে যাচ্ছে উত্তর।

হলটা কী শালিনীর? কাল গোটা টিফিনটা সাবড়ে দিয়েছিল বলে আর সে টুপুরের কাছাকাছি ঘেঁষতে রাজি নয়! নাকি স্বপ্নের ঘটনাটা পুরো গুলগাপ্পি। পাছে স্বপ্নটা নিয়ে টুপুর ফের জেরা শুরু করে এবং বানানো গল্পটি ধরা পড়ে যায়, তাই শালিনী দূরে-দূরে থাকছে? মিতিনমাসি একটা রহস্যের গন্ধ পর্যন্ত পেয়েছিল, একদিনে সবই চৌপাট হয়ে গেল?

কিন্তু টুপুর অত সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নয়। শেষ না দেখে সে ছাড়বেই না।

স্কুল ছুটির ঘণ্টা বাজতেই টুপুর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল শালিনীর উপর। গেট পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই ধরেছে শালিনীকে। ক্ষুব্ধ গলায় বলল, "তোর কেসটা কী রে? তুই কোনও কারণে আমার উপরে রাগ করেছিস?"

শালিনী সামান্য থতমত খেয়ে বলল, "কই, না তো।"

"তা হলে আমাকে আজ দেখতেই পাচ্ছিস না যে বড়?... জানিস, তোর স্বপ্নটা নিয়ে কাল আমি বাড়ি গিয়েও কত ভেবেছি, ইনফ্যাক্ট স্বপ্নটার কী অর্থ হতে পারে তাই নিয়ে আমি..."

"আহ্, ঐন্দ্রিলা, থাক না," শালিনী থামিয়ে দিল টুপুরকে, "আমি এই জন্যই তোর থেকে তফাতে আছি।"

"মানে?"

"ওই স্বপ্নটা নিয়ে আর আলোচনার ইচ্ছেই নেই আমার।"

"কেন রে?"

"অত কৈফিয়ত দিতে পারব না," শালিনী এবার যেন একটু বিরক্ত, "ধরে নে, আমি কোনও স্বপ্নটপ্ন দেখিইনি।"

"যাঃ বাবা, কাল যে তুই অত কিছু বললি?"

"ধর, আমি মজা করছিলাম..."

"উঁহু, তুই কাল খুবই সিরিয়াস ছিলি," টুপুর ভুরু কোঁচকাল, "হঠাৎ চেপে যেতে চাইছিস কেন?"

"আহ, ঐন্দ্রিলা আমায় বোর করিস না। আমার ভাল লাগছে না।"

"কেন রে? স্বপ্নটা নিয়ে কিছু হয়েছে নাকি?"

শালিনী একটুক্ষণ নীরব। তারপর আচমকাই ফুঁপিয়ে উঠল, "আমায় কিছু জিজ্ঞেস করিস না, প্লিজ।"

টুপুর হতভম্ব। কী বলবে ভেবে পেল না। ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ শালিনী খপ করে টুপরের হাত চেপে ধরল। নাক টেনে বলল, "এই স্বপ্নটা নিয়ে বাড়িতে কাল খুব অশান্তি হয়েছে রে।"

"কীরকম?" টুপুর ফের কৌতূহলী।

"স্কুলে বন্ধুদের কাছে গল্প করেছি শুনে ছোড়দাদু খুব রাগ করলেন। বললেন, এতে নাকি আমার অমঙ্গল ঘটতে পারে। শুনে অমনি বাবাও..."

"দাঁড়া-দাঁড়া," টুপুর হাত তুলে শালিনীকে থামাল, "ছোড়দাদুর কথা তো কাল বলিসনি। উনিও কি তোদের বাড়িতে থাকেন?"

"না-না, উনি তো সবে গত রবিবার কলকাতায় এসেছেন।"

মিতিনমাসি কি এরকমই কারও আগমনের সম্ভাবনা আন্দাজ করেছিল কাল? কথাটা মনে হতেই টুপুর প্রশ্ন করে ফেলল, "উনি থাকেন কোথায়?"

"ওঁর কোনও ঠিকঠিকানা ছিল না। সন্ন্যাসী মানুষ, পথে-পথেই নাকি থাকতেন। আমার জন্মের ঢের আগেই তো উনি ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এখন রাজস্থানে এক আশ্রমে বাস করেন। রনকপুরে। কলকাতা ফিরলেন বোধ হয় টোয়েন্টি ইয়ার্স পরে।"

"ও। তা উনি বুঝলেন কী করে স্বপ্নটা অন্যদের বললে তোর ক্ষতি হতে পারে?"

"আমি কী করে বলব? বাবাও ওঁর কথা মেনে নিলেন যে," শালিনীর গলা ধরা-ধরা শোনাল, "ফেসবুকে স্বপ্নটা পোস্ট করেছিলাম তো, সেটা জানতে পেরে বাবা আরও রেগে গিয়েছিলেন। এখন বাবার কড়া হুকুম, আমি যেন স্বপ্নটা নিয়ে কারও সঙ্গে আর ডিসকাস না করি।"

টুপুর আহত স্বরে বলল, "অদ্ভুত হুকুম। একটা স্বপ্ন কী এমন হাতিঘোড়া যে, তাই নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গেও কথা বলা নিষেধ?"

"আমি জানি না রে। ছোড়দাদু বারণ করলেন বলেই হয়তো..." শালিনীর স্বর এবার যথেষ্ট করুণ, "অথচ কাল রাতেও আমি স্বপ্নটা দেখেছি।"

"তাই নাকি? একই স্বপ্ন?"

"ছাড়, ভুলে যা," শালিনী ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল, "ওই স্বপ্ন দেখতে-দেখতেই হয়তো কোনওদিন হার্টফেল করে যাব। হয়তো সেটাই আমার নিয়তি।"

ভারী দুঃখী-দুঃখী দেখাল শালিনীর মুখখানা। স্কুলবাস হর্ন দিচ্ছে, বাসের পানে দৌড় দিল শালিনী। টুপুরের বাড়ি কাছেই। হাঁটতে শুরু করল মন্থর পায়ে। মেজাজটা যেন বিগড়ে গিয়েছে হঠাৎ। শালিনীর স্বপ্নটা নিয়ে আর এগনো যাবে না জেনে একটা অক্ষম ক্ষোভও জ্বালা ধরাচ্ছে বুকে। মিতিনমাসিও নিশ্চয়ই বিরক্ত হবে টুপুরের উপর। ভাববে মেয়েটা অকস্মাই রয়ে গেল। পার্থমেসো অবশ্যি মজা পাবে খুব। মাসি-বোনঝি একসঙ্গে হতাশ হলে মেসো তো তালি বাজাবেই। বাড়ি এসে আর বেরতে ইচ্ছা করছিল না টুপুরের। সহেলি দইবড়া বানিয়েছেন দুপুরে। খুব একটা পছন্দের খাবার না হলেও নির্বিবাদে খেয়ে নিল আজ। এবার বাবার ল্যাপটপখানা খুলে বসলে হয়। মা-বাবাকে না জানিয়ে সম্প্রতি একটা ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলেছে টুপুর। ছোট্ট একটা বন্ধুবৃত্ত তৈরি হয়েছে ফেসবুকে। বিকেলবেলাটাই তাদের সঙ্গে খানিক বৈদ্যুতিন গল্প আড্ডা চালানোর আদর্শ সময়।

ল্যাপটপ চালু করতে গিয়েও থমকাল টুপুর। শিয়রে সমন। কাল

ক্লাস টেস্ট আছে, ইতিহাসের। পর্তুগিজ, ডাচ, ইংরেজ, ফরাসিদের ভারতে আগমন, তাদের ব্যবসাবাণিজ্য, পলাশির যুদ্ধ এইসব নিয়েই পরীক্ষা। সাল, তারিখ, ঘটনাপ্রবাহ একদম স্মরণে থাকে না টুপুরের, বড্ড গুলিয়ে যায়। কিন্তু যদি সে ধ্যাড়ায় পরীক্ষায়, মা তাকে কাঁচা চিবিয়ে খাবে। মিতিনমাসির শাগরেদি করার যেটুকু যা ছাড় মেলে, তাও হয়তো জুটবে না আর। সুতরাং মানে-মানে বইপত্র খোলাটাই এখন বেশি জরুরি।

এইসব সাতপাঁচ ভেবে সবে টুপুর পড়ার টেবিলে বসেছে, অমনি মোবাইল ফোনটা ঝনঝন। টুপুরদের স্কুলে মোবাইল ফোন নিয়ে যাওয়া বারণ, তাই দিনভর বাড়িতেই পড়ে থাকে ফোনটা। এখন হঠাৎ সচল হল যে বড়? স্কুলের কেউ ডাকাডাকি করছে? শালিনীর সঙ্গে টুপুরের গুজগুজ নিয়ে কৌতূহল? নাকি পাড়ার কোনও বন্ধু?

মনিটরে দৃষ্টি পড়তেই ঈষৎ অস্বস্তি। মিতিনমাসি! কী বলবে এখন সে মাসিকে? একটু গলা ঝেড়ে টুপুর স্বর ফোটাল, "হ্যাঁ, বলো।"

"বলবি তো তুই, তোকে যা জানতে বলেছিলাম..."

"ওসব জেনেটেনে কোনও লাভ নেই গো মাসি। শালিনী স্বপ্নটাকে পুরো গিলে নিয়েছে বাড়ির লোকজনের গুঁতোয়।"

"আহ, তোকে যা করতে বলেছিলাম সেটা করেছিস কি?"

মাসির গলায় উষ্মার আভাস। টুপুর চটপট শালিনীর ছোড়দাদুর উপাখ্যানটা শুনিয়ে দিল। কয়েক সেকেন্ড ওপ্রান্তে কোনও সাড়াশব্দ নেই। তারপর ফের মাসির কণ্ঠ, "আমার আন্দাজটা তা হলে ভুল নয়। গড়বড় একটা তা হলে সত্যিই আছে।"

"মানে?"

"এককথায় তো মানে বোঝানো যাবে না। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, শালিনী তার বাবার কাছে বকুনি খেয়েছে রাতে খাওয়ার সময়। সম্ভবত খেতে বসে উৎসাহ নিয়ে বলছিল, তখনই প্রথমে ওর ছোড়দাদু ওকে ধমকায় এবং তারপর ওর বাবা।"

টুপুর অবিশ্বাসের সুরে বলল, "তুমি কী করে শিওর হচ্ছ?"

"কারণ শালিনী কাল সন্ধেবেলায় স্বপ্নটা পোস্ট করেছিল ফেসবুকে। তখন ঘড়িতে আটটা ছয়। রাত দশটার পর স্বপ্নটা ফেসবুক থেকে মোছা হয়েছে।"

টুপুরের গলা থেকে বিস্ময় ঠিকরে এল, "তুমি হঠাৎ শালিনীর ফেসবুকে গেলে কেন?"

"ওর স্বপ্নটা আমায় খুব হন্ট করছিল যে। তাই মনে হল মেয়েটার নেচারটা একটু স্টাডি করি।"

"কী বুঝলে ওর ফেসবুক ঘেঁটে?"

"মেয়েটা খুব চাপা ধরনের। খুব বাচ্চাবেলা থেকেই ওর মধ্যে একটা ভয় বাসা বেঁধে আছে। নিজের কোনও ফোটো দেয়নি ফেসবুকে, ওর বয়সি একটা মেয়ের ক্ষেত্রে যা রীতিমতো অস্বাভাবিক। বন্ধুর সংখ্যাটাও খুব কম, সেটাও ওর ফেসবুক করা নেচারের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।"

"হ্যাঁ গো মাসি, মেয়েটা একটু আজব ধরনের। নইলে রোজ-রোজ এক স্বপ্ন দ্যাখে!"

"এবং এমন স্বপ্ন যেটা তার বাড়ির লোক জনসমক্ষে চাউর করতে রাজি নয়," মিতিনের স্বর সামান্য উত্তেজিত, "না রে টুপুর, ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতেই হবে। আমার মনে হচ্ছে পরিবারটায় কিছু গোপন ঘটনা আছে। ওই স্বপ্নটা তারই একটা মূল্যবান সূত্র।"

"... স্বপ্ন...সূত্র..." টুপুর বিড়বিড় করল, "কীভাবে?"

"সেম ড্রিম রিপিট হচ্ছে...অর্থাৎ মেয়েটার মনে এমন কোনও ছবি আঁকা আছে যেটা ফিরে-ফিরে আসছে। আর এটা ঘটছে ওই ছোড়দাদুর আবির্ভাবের পরেই। উঁহুঁ, দিস ইজ নট ক্যাকতালীয়।"

"কিন্তু মাসি আমরা এগোব কী করে? শালিনীর বাবা মোটেই আমাদের অ্যালাউ করবেন না।"

"তার জন্য উপায় টুঁড়তে হবে। তুই শুধু আপাতত শালিনীর উপর ওয়াচ রেখে যা।"

"কিন্তু তুমি..."

"পরে কথা হবে," টুপুরের প্রশ্নটা থামিয়ে দিল মিতিন। বলল, "কাজ আছে, রাখছি।"

এমন আচমকা ফোন কেটে দিল মাসি, টুপুর হতভম্ব। খুব গভীর চিন্তায় থাকলে মাসি এরকম করে দেখেছে টুপুর। কিন্তু চিন্তাটা যে কেন, সেটাই মগজে ঢুকছে না।

কী এমন আছে শালিনীর স্বপ্নটায়। স্মরণ করল টুপুর। একটা দানব টাইপ লোক শালিনীকে নিয়ে লোফালুফি খেলছে! একটা লোক থেকে দুটো লোক!! দু'নম্বর লোকটি নাকি দেওয়ালে ঝোলে! কোত্থেকে একটা লাঠি বেরিয়ে আসে। তারপর লাঠি, দেওয়াল, গর্ত...এসবের মানে কী? তবে মিতিনমাসি কেসটা নেওয়ার জন্য যেভাবে উতলা হয়ে পড়েছে, নির্ঘাৎ একটা অর্থ বের করে ফেলেছে স্বপ্নটার। সেই অর্থটি অবশ্যই রোমাঞ্চকর। খামোকা মিতিনমাসির মগজের সঙ্গে পাল্লা টানার দরকার কী টুপুরের? কেসটা মিতিনমাসি টুপুরের মাধ্যমেই তো পাচ্ছে, সুতরাং টুপুর তো অনুসন্ধানে থাকবেই।

কিন্তু কী নিয়ে অনুসন্ধান, সেটাই তো ছাই আঁধারে। কোনও মানে হয়!

"ধুৎতেরি," বলে ল্যাপটপখানা অন করল টুপুর। ফেসবুকে গিয়ে দেখল দু'-তিনজন বন্ধু উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে জানলায়। আড্ডা জুড়তে গিয়েও কী মনে করে খুঁজতে লাগল শালিনীকে। কী কাণ্ড, মিলছে না কেন? ভুস করে উবে গেল যে। শালিনীর বাবা কি মেয়ের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে তালা ঝুলিয়ে দিলেন? ভারী অন্যায়, ভারী অন্যায়। বাবা ভদ্রলোকটি নিজে কি আছেন ফেসবুকে?

খুঁজতে না খুঁজতেই মিলেছে সন্ধান। হ্যাঁ, বহাল তবিয়তে মজুত। আকাশচাঁদ শেঠ। প্রোফাইলটা তো রিটকেল। শখ, পেশা কিচ্ছু দেননি আকাশ। তার বদলে রয়েছে একটা হেঁয়ালিমার্কা ঠিকুজি।

নাগৌর-পটনা-রাজমহল-মুর্শিদাবাদ-মহিমাপুর-ওংগঙ্গা।

হীরামানিক-ফতেস্বরূপ-ওংগঙ্গা। এটা কি কোনও পরিচয় হতে পারে?

নাহ এই পাগল পরিবার নিয়ে মগজকে ট্যাক্স করে লাভ নেই। বরং ইতিহাস বইটা খুললে খানিকটা কাজ হয়।

ল্যাপটপকে ঘুম পাড়িয়ে এবার টুপুর পাঠে মনোযোগী। তারই মধ্যে টের পেল বাবা ফিরলেন কলেজ থেকে। ইতিহাসটা বাবার কাছে পড়তে মন্দ লাগে না খুব একটা। ঘটনার পর-ঘটনা এমন সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেন অবনী, পুরনো সময়টা যেন চোখের সামনে দেখতে পায় টুপুর। কিন্তু বিপদও আছে। কোর্স, সিলেবাসের কথা মাথায় থাকে না বাবার, ইতিহাসে ডুবে গিয়ে এক প্রসঙ্গ ছেড়ে চলে যান আর-এক প্রসঙ্গে, তখন তাঁকে বইয়ের পাতায় ফেরানোই মুশকিল। এই তো গত সপ্তাহেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতে পাড়ি দেওয়ার বিবরণ দিতে গিয়ে ঢুকে পড়লেন ইউরোপের ইতিহাসে, ফ্রান্স-ইংল্যান্ডের যুদ্ধে। ভারত তখন অবনীর মন থেকে কোথায় হাওয়া।

তবু টুপুর বাবার কাছে যাওয়ার জন্য উশখুশ করছিল। পলাশীর যুদ্ধের বিশদ ইতিহাসটা মগজে পুরে নিতে পারলে হাফ-ইয়ার্লি, অ্যানুয়ালের প্রস্তুতিটাও হয়ে যাবে একবারে। উঠতে যাচ্ছিল টুপুর, আবার মোবাইল ঝনঝন এবং মিতিনমাসি।

টুপুর উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ার আগেই মিতিনের নিরুত্তেজ স্বর, "সোমবার তোদের ছুটি আছে না? জন্মাষ্টমীর? শনিবার স্কুল থেকে ফিরে তৈরি থাকিস।"

"কেন গো? কোথাও যাবে নাকি?"

"মেসো তোকে এখানে নিয়ে আসবে। রোববার আমরা শালিনীর বাড়ি যাব।"

কত যে প্রশ্ন ভুসভুস করছে টুপুরের পেটে। কিন্তু গলার স্বর ফুটছে না কেন!

॥ ৪ ॥

বাড়িটার নাম 'সাদার্ন হাই'। রবীন্দ্র সরোবরের একেবারে সামনেই। গেটের সামনে সবুজ বুলেভার্ডশোভিত রাস্তার ধারে গাড়িখানা পার্ক করল মিতিন। ইশারা করল টুপুরকে, "আয় এবারে ঢুকেই পড়ি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুপুরের বুক ধুকধুক করছিল। কাল স্কুলে পাখি পড়ার মতো করে বুঝিয়েছে শালিনীকে। বলেছে, "তোর কোনও চিন্তা নেই, আমার মাসি ভুলেও নিজে থেকে স্বপ্নের কথা তুলবে না। শুধু তোর বাবার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করেই চলে আসবে।"

টুপুর যে স্বপ্নটা শালিনীর মুখে শুনেছে, সেটা পর্যন্ত প্রকাশ হবে না, কথা দিয়েছে টুপুর।

অবশ্য মিতিনের যাওয়ার জুতসই একটা কারণ বানাতে হয়েছে। মাসিই তৈরি করে দিয়েছে গুছিয়ে। মিতিন আজ গোয়েন্দা নয়, একজন ইতিহাসবিদ। কলকাতার জৈনদের উপর গবেষণা করছে। ওই বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ করতে আকাশচাঁদের বাড়ি যাচ্ছে সে। শালিনীও তাই জানে। আকাশচাঁদও। মাসি যা ওস্তাদ অভিনেতা, স্বচ্ছন্দে ঐতিহাসিকের ভূমিকায় মানিয়ে নেবে। কিছুতেই ধরা পড়বে না। টুপুর স্থির নিশ্চিত।

তবু যে কেন নার্ভাসনেসটা কাটছে না। শালিনীকে ঠকাচ্ছে বলে? নাকি মাসির প্রকৃত উদ্দেশ্য ঠাহর করে উঠতে পারছে না তাই? কাল মাসির বাড়িতে পা রাখার পর না হক পনেরো-ষোলো ঘণ্টা তো কেটেইছে, একবারও কি মাসি বলল স্বপ্নটায় কী রহস্য থাকতে পারে? পার্থ মেসো কত খ্যাপাল, তবু মাসির ঠোঁটে কুলুপ। কী যে হতে চলেছে বুঝতে না পারলে অস্বস্তি তো থাকবেই। উর্দিধারী রক্ষীর খাতায় নাম, ঠিকানা লিখে লিফ্‌টে চড়েছে মাসি-বোনঝি। দশতলায় বেরিয়ে সামনেই পিতলের নেমপ্লেট জ্বলজ্বল করছে, আকাশচাঁদ শেঠ।

আজ শাড়ি পরেছে মিতিন। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। কাচে পাওয়ার নেই বটে, কিন্তু ওই চশমার দৌলতে বেশ একটা অধ্যাপিকাসুলভ ব্যক্তিত্ব এসেছে মিতিনের চেহারায়। শাড়ির আঁচল গুছিয়ে মিতিন বেল টিপল। পাল্লা খুলে গিয়েছে। দরজায় এক বছর পঁয়তাল্লিশের ভদ্রলোক। ধবধবে ফরসা, মাঝারি হাইট। পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। মাথার সামনের দিকটা প্রায় ফাঁকা। তবে স্বাস্থ্যটি ভারী মজবুত। একঝলক মিতিনকে দেখলেন ভদ্রলোক। পরক্ষণে টুপুরকেও। তারপর স্মিত মুখে আহ্বান জানালেন দু'জনকে। বসিয়েছেন প্রকাণ্ড লিভিং রুমের নরম সোফায়। আলাপ সাঙ্গ হতেই বিনম্র স্বরে মিতিনকে জিজ্ঞেস করলেন, "একটু চা খাবেন তো দিদি, নাকি কফি?"

"কিছু না হলেও চলবে," মিতিন সহজ গলায় বলল, "আপনি ব্যস্ত মানুষ। বেশি সময় নষ্ট করব না আপনার। কাজের কথাটুকু সেরেই চলে যাব।"

"তা বললে চলে," আকাশ জোরে-জোরে ঘাড় নাড়লেন, "আপনি আমার মেয়ের বান্ধবীর মাসি। একটু অতিথি সৎকারের সুযোগ তো দিতেই হবে।"

"বেশ, তা হলে কফিই হোক। তবে শুধুই কফি, দুধ-চিনি ছাড়া।"

"আমারও ঠিক ওটাই পছন্দ," টুপুরের দিকে ফিরলেন আকাশ, "আর তুমি? দুধ খেতে পার। ওই দ্রব্যটি আমাদের বাড়িতে অঢেল পরিমাণে মজুত থাকে।"

দুধের নাম শুনলেই গা গুলিয়ে ওঠে টুপুরের। ঢোক গিলে টুপুর বলল, "পেট ভর্তি, একটু ঠান্ডা জল পেলেই যথেষ্ট।"

"আমরা তো ঠান্ডা জল রাখি না," আকাশকে একটু অপ্রস্তুত দেখাল, "ঠান্ডা জলে নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়া জন্মায় তো, তাই পারতপক্ষে..."

"জানি," মিতিন মৃদু হাসল, "আপনারা সাধ্যমতো প্রাণীহত্যা এড়িয়ে চলেন। জৈন ধর্মে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে অহিংসাকে সব থেকে বেশি মান্যতা দেওয়া হয়।"

"আপনি তো জানবেন বটেই। আমাদের ধর্ম নিয়েই তো আপনি..." আকাশ একমুহূর্ত থামলেন। ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, "তবে আমি খুব ধার্মিক মানুষ নই। আজকালকার দিনে যেটুকু মানা সম্ভব, সেইটুকুই কোনওমতে পালন করি।"

টুপুর অনেকক্ষণ ধরেই ছটফট করছিল। চোখ ঘুরিয়ে ঘরের দেওয়াল দেখার ছলে উঁকি দিচ্ছিল আকাশচাঁদের অন্দরমহলে। থাকতে না পেরে বলেই ফেলল আচমকা, "শালিনী কোথায়? ও বেরচ্ছে না কেন?"

"শালিনী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।"

"সে কী? কাল দুপুরে স্কুল ছুটির সময়েও তো ও ঠিক ছিল। বলল, কাল এখানে এলে আমার সঙ্গে কত গল্প করবে।"

"ও কাল সন্ধে থেকেই কাহিল। শেষ শ্রাবণের কড়া রোদ্দুরে ভাজা-ভাজা হয়ে ফিরল। ফিরেই ঘরে এসি চালিয়েছিল। ব্যস, ঠান্ডা লেগে গিয়েছে।"

"একবার কি ওকে দেখে আসব?"

"উপায় নেই, রাত থেকেই ধুম জ্বর। এখন ও ঘুমোচ্ছে।"

টুপুর বেজায় হতাশ। শালিনীর সঙ্গে মাসির যদি দেখাই না হয়, তা হলে আজ আসাটাই তো বৃথা। যাঃ, সকালটাই মাটি হল আজ। পার্থমেসো খুব খ্যাপাবে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! মাসির কোনও হেলদোল নেই। দিব্যি কথা শুরু করে দিয়েছে আকাশচাঁদের সঙ্গে। হাসি-হাসি মুখে বলছে, "আপনার বাংলাটি ভারী চমৎকার।"

"স্বাভাবিক। সাত-আট পুরুষ বাংলায় আছি," আকাশচাঁদের স্বরে গর্ব ঝরে পড়ল, "আমাদের এক পূর্বপুরুষ পটনা ছেড়ে ঢাকা হয়ে মুর্শিদাবাদে বসবাস শুরু করেন। তারপর তো আমরা আর আমাদের আদি বাসস্থানে ফিরিইনি।"

"পটনা থেকে যিনি এসেছিলেন, তাঁর নাম কি হীরানন্দ শাহ?"

"কেন বলুন তো?" আকাশ ঈষৎ থমকেছেন, "তাঁর নাম জেনে কী লাভ?"

"আমি একটা হিসেব মেলাতে চাইছি," মিতিন টানটান হয়ে বসল, "আপনাদের আদি বাসস্থান কি রাজস্থানের ওসনগরে? আপনারা কি জাতে ওসওয়াল?"

"ঠিক, একদম ঠিক। চুরাশি ঘর মারোয়াড়ি বণিকের মধ্যে আমরাই ছিলাম অগ্রগণ্য। তবে এখন আমরা বাঙালিই হয়ে গিয়েছি।"

"হুম। দু'য়ে-দু'য়ে চারই হচ্ছে।"

"কীভাবে?"

"আমার ডেটা অনুযায়ী বিখ্যাত বণিক জগৎ শেঠদের কোনও বংশধর এই শহরেই বাস করছেন," মিতিন আকাশচাঁদের চোখে চোখ রাখল, "এবং অনুমান যদি ভুল না হয়, আপনি ওই জগৎ শেঠ পরিবারেরই একজন।"

পলকের জন্য চোখজোড়া উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আকাশচাঁদের। পরক্ষণেই যেন নিভে গেল মণিদুটো। ম্রিয়মাণ স্বরে বললেন, "থাক না প্রসঙ্গটা। আমরা কি অন্য টপিক নিয়ে আলোচনা করতে পারি না?"

মিতিনের ভুরুতে পলকা ভাঁজ, "আপত্তির কারণটা জানতে পারি?"

"কবে ঘি খেয়েছি এখনও তার ঢেকুর তুলব, এ আমার ভাল লাগে না ম্যাডাম," আকাশ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, "একটু বসুন। আমি কফির বন্দোবস্তটা সেরে আসি।" বলেই দ্রুত এল শেপের লিভিং রুমটা ছেড়ে অন্দরে মিলিয়ে গেলেন আকাশ।

টুপুর ফিসফিস করে বলল, "মূল কথাটা তো আসছেই না মাসি। স্বপ্ন, রহস্য সব ভোঁ ভাঁ হয়ে গেল নাকি?"

মিতিন নিরুত্তর। নির্বিকার। ভাবলেশহীন মুখে দেখছে হলখানা। দূরে দেওয়ালে গাঁথা শ্বেতপাথরের ছোট্ট সিংহাসনে কোন এক ঠাকুরের মূর্তি। পদ্মাসনে বসা দুধসাদা মূর্তিটার চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। সম্ভবত দামি কোনও পাথর। একদৃষ্টে সেইদিকেই তাকিয়ে আছে মিতিন। মূর্তির একপাশের দেওয়ালে একটা বাঁধানো ফোটো। গোঁফওয়ালা, টাকমাথা এক প্রৌঢ়। মিতিন ছবিটাও দেখছে যেন।

ফিরেছেন আকাশচাঁদ। সামান্য কাঠ-কাঠ স্বরে বললেন, "আপনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলকাতার জৈন সম্প্রদায়ের মানুষদের সম্পর্কে প্রশ্ন করুন না? যতটুকু যা জানি, অবশ্যই বলব।"

মিতিন একটু চিন্তা করে বলল, "তথ্য জোগাড় করাটা তো আমার লক্ষ্য নয়। ইন্টারনেট ঘাঁটলেই তো ভুরি-ভুরি ইনফরমেশন মিলবে। আসলে আমি কলকাতার জৈনদের একটু অন্য ভাবে জানতে চাই। তাদের পারিবারিক কাঠামো, কীভাবে সেটা বদলাচ্ছে কিংবা আদৌ বদলাচ্ছে কিনা, রাজস্থান-উত্তরপ্রদেশের জৈনদের সঙ্গে তাদের কতটা ফারাক, এইসব আমার গবেষণার বিষয়। তার জন্য আমি এক-একটা জৈন পরিবার বেছে তাদের পরিবারের কাহিনি বিশদে নোট ডাউন করছি। আমি তাদের নাম, পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখব, এটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি।"

একটু যেন সহজ হলেন আকাশচাঁদ, "আমি তো আপনাকে হেল্পই করতে চাই।" হাতের মুঠোয় ধরা মোবাইলটা সেন্টার টেবিলে রেখে মিতিন সোফায় হেলান দিয়ে বলল, "কলকাতায় আপনাদের অরিজিনাল বাড়ি কোথায়?"

"উত্তর কলকাতায়। মানিকতলার কাছে গৌরীবাড়ি নামে একটা জায়গা আছে..."

"আমি চিনি। আপনাদের পরেশনাথের মন্দিরটা তো ওখানেই।"

"পরেশনাথ মন্দিরের খুব কাছেই আমাদের বাড়ি ছিল। অনেকদিনের পুরনো, তা অন্তত দেড়শো বছর তো হবেই।"

"অর্থাৎ মোটামুটি পাঁচ পুরুষ আগের। তখন আপনারা যৌথ পরিবারে ছিলেন নিশ্চয়ই। এখন তো পরিবার টুকরো-টুকরো। বাকিরা কোথায়-কোথায় ছড়িয়ে আছেন?"

"এক-দু'জন চলে গিয়েছেন রাজস্থানে। নাগৌরে। ওয়েস্ট বেঙ্গলে মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ, লালগোলার দিকে থাকেন কয়েকজন। কেউ বা কলকাতাতেও আছেন।"

"কলকাতার কোথায়?"

"ওই পরেশনাথ মন্দিরের কাছে। বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রিট। আমাদের পুরনো বাড়িতে।"

"ও। তার মানে বাড়িটা এখনও আছে?"

"ভেরি মাচ। দোতলাটা অবশ্য পুরো ভেঙে রেনোভেট করেছিলেন আমার পিতাজি। সেও প্রায় চল্লিশ বছর আগে। আমার ছেলেবেলায়।"

"ও। তা এখন সেখানে থাকেন কে? আপনার নিকটাত্মীয় কেউ?"

"খুবই আপনজন। আমার বড়ে ভাই। মানে আমার দাদা।"

"আপনারা দুই ভাই পৃথক হয়ে গিয়েছেন বুঝি?"

"অনেকদিন। আমার মেয়ে তখন বছরখানেকের। সে এখন থার্টিন প্লাস।"

মধ্যবয়সি এক কাজের লোক মিতিনের কফি এনেছে। সঙ্গে বড় প্লেটভর্তি কাজু-কিশমিশ। পাশে গ্লাসে কী এক পানীয়। আকাশচাঁদের অনুরোধে টুপুরকে গিলতে হল পানীয়টা। স্বাদটা অবশ্য মন্দ নয়, দুধের মধ্যে সম্ভবত পেস্তা-বাদামবাটা মিশিয়ে বানানো। তবু ওই দুধ আছে বলেই পেটটা যেন কেমন কিরকির করছে। তাড়াতাড়ি একমুঠো কাজু মুখে পুরে দিল টুপুর।

মিতিন কালোবরণ কফিতে চুমুক দিচ্ছে। কাপটা নামিয়ে রেখে হঠাৎ বলল, "যদি একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি, জবাব মিলবে কি?"

"আগে প্রশ্নটা শুনি।"

"বারো-তেরো বছর আগে আপনার বয়স ছিল বড় জোর ত্রিশ-বত্রিশ। আপনার মেয়ে তখন প্রায় কোলে। ওই রকম একটা সময়ে ভাইয়ে-ভাইয়ে আলাদা হওয়াটা খুব একটা স্বাভাবিক ঘটনা নয়। বিশেষত আপনাদের মারোয়াড়ি সমাজে," মিতিন অল্প ঝুঁকল, "দাদা-ভাইয়ে একেবারেই বনিবনা ছিল না বুঝি।"

"আমরা একেবারেই অন্য ধরনের মানুষ। দাদা গোঁড়া প্রাচীনপন্থী, ভীষণ রক্ষণশীল ধরনের। সেই ছোটবেলা থেকেই। বাবা যদ্দিন ছিলেন, কোনও রকমে মানিয়ে চলেছি। উনি গত হওয়ার পর আর একত্র বাস সম্ভব হয়নি।"

"এই ফ্ল্যাটখানা কিনে উঠে এসেছিলেন? নাকি এটি পরে কেনা?"

"কোনওটাই নয়। ফ্ল্যাটটা কিনেছিলেন আমার বাবা। অ্যাসেট হিসেবে। ভাল দাম পেলে বেচে দেবেন বলে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। দাদা আর আমি আপসে সম্পত্তি ভাগাভাগি করে ফেলি। দাদা আমাদের পুরনো বাড়িটা নেয়, আমি পাই সাদার্ন হাইয়ের এই অ্যাপার্টমেন্ট।"

টুপুরের অসহ্য লাগছিল। মাসির এই একঘেয়ে প্রশ্নমালার কোনও মাথামুন্ডুই খুঁজে পাচ্ছিল না। আকাশচাঁদের পারিবারিক সম্পত্তির খবর জেনে লাভ আছে কোনও? অবশ্য মাসির মনের গতিপথ ঠাহর করা অসম্ভব। উদ্দেশ্য একটা আছে হয়তো, পরে বোঝা যাবে। তখন হয়তো মনে হবে মাসির মতো ভাবতে শেখা কতটা জরুরি।

একই খাতে চলেছে মিতিনের জিজ্ঞাসা, "আপনার দাদা তা হলে গোটা বাড়িটাই পেয়ে গেলেন? সঙ্গে অনেকটা জমিও আছে নিশ্চয়ই?"

"তা আছে। প্রায় এক বিঘা মতো," আকাশচাঁদের ঠোঁটে আবছা ধূর্ত হাসি, "কিন্তু বাড়িটা মেনরোড থেকে অনেকটা ভিতরে। সামনের রাস্তা তেমন চওড়া নয়, সুতরাং প্রোমোটার ছোঁবে কিনা সন্দেহ। ঘরগুলো পেল্লাই-পেল্লাই, ইয়া-ইয়া থাম আছে এককাঁড়ি, বিশাল-বিশাল দরজা-জানলা, ওসব মেনটেন করা কি কম ঝকমারি? তা ছাড়া..."

"তা ছাড়া কী?" মিতিনের স্বরে একটু ব্যগ্রতা ফুটল, "কোনও বখেড়া আছে বুঝি?"

"ঠিক তা নয়। তবে মালিক তো দাদা একা নয়। ভাগীদার আছে," আকাশচাঁদ মুচকি হাসলেন, "সেই ভাগীদার এসেও গিয়েছে।"

"মানে?"

"জমিবাড়ির মালিক তো ছিল দু'জন। আমার বাবা আর কাকা। কাকা বহুকাল আগে সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তাই বাবা, তারপর দাদা, বাড়িটা একাই ভোগ করছিলেন। কিন্তু গত সপ্তাহে সেই কাকা ফিরে এসেছেন। উনি নিজের অংশ হিসেবে একতলাটা

আমাদের প্রকাশনার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

সমরেন্দ্রনাথ মোদক প্রণীত স্কুল অ্যাটলাস

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি)

প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর সংগ্রহে রাখার মতো একটি অতি প্রয়োজনীয় বই

এছাড়া লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

একাদশ আধুনিক ভূগোল (XI) | দ্বাদশ আধুনিক ভূগোল (XII) | ব্যবহারিক ভূগোল (XI) | ব্যবহারিক ভূগোল (XII)

গৌতম বসু প্রণীত সভ্যতা ও স্বদেশ (IX, X, XI, XII)
একটি ব্যতিক্রমী গ্রন্থ

রাজেন্দ্রনাথ গিরি প্রণীত সহজ কম্পিউটার (V, VI, VII, VIII)
কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন (XI, XII)

M. BANERJEE & BROTHERS
Publishers & Book-Sellers
10/2B, RAMANATH MAJUMDER STREET, KOLKATA-700009 Ph.: (033) 2241-6563, 6506-6678

চাইছেন। এখন কী সব নাকি করবেন,” আকাশচাঁদের হাসি চওড়া হল, “দাদা এখন মহা ক্ষিপ্ত। রোজ দু'বেলা আমার উপর চোটপাট করছে।”

“কেন? আপনি কী দোষ করেছেন?”

“কাকা এসে প্রথমে আমার বাড়িতেই উঠেছিল যে। দাদা তাই ভেবে নিয়েছে...” হঠাৎ আকাশচাঁদের স্বর থেমে গেল। চোখ সরু করে বললেন, “জৈনদের নিয়ে গবেষণা করতে গেলে এই সব তথ্যও কি আপনার কাজে লাগবে?”

“না-না, আপনি গল্পের মতো করে বলছিলেন, শুনতে বেশ লাগছিল,” মিতিনের ঠোঁটে অমায়িক হাসি, “বাই দ্য বাই, আপনারা তো শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের জৈন, তাই তো?”

“হ্যাঁ। কলকাতার বেশির ভাগ জৈনই শ্বেতাম্বর। এখানে দিগম্বর সম্প্রদায় অনেক কম।”

“আপনারা সকলেই কি ব্যবসা-বাণিজ্য করেন?”

“মোটামুটি। তবে অনেকেই তো আজকাল উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে, তারা চাকরিবাকরিও করছে। আমাদের মধ্যে ডাক্তার, অ্যাডভোকেটও কম নেই। আমার মেয়েকেই তো ভাবছি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বানাব, যাতে ও আমার ব্যবসাটা দেখতে পারে।”

“আপনিও কি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার?”

“নট অ্যাট অল। আমি টেনেটুনে বি কম। কম্পিউটার ছিল আমার নেশা। নিজে-নিজেই শিখে এক্সপার্ট হয়েছি। আগে একা-একাই ওয়েব ডিজাইন করতাম। এখন ওই লাইনেই কারবার ফেঁদে বসেছি। বাপ-ঠাকুরদার মতো শেয়ার মার্কেটে আমার আগ্রহ নেই।”

“আপনার দাদা বুঝি শেয়ার লাইনেই?”

“হুঁ।”

“ওঁকে আপনি গোঁড়া বললেন কেন? উনি বুঝি খুব ধর্ম-ধর্ম করেন?”

“সেটা এমন কিছু খারাপ কাজ নয়। দাদার অনেক অন্ধবিশ্বাস আছে। যেমন, অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খেলে নাকি ধর্ম নষ্ট হয়, সন্ধের পর কিছু খাওয়া মানেই প্রাণীহত্যার সম্ভাবনা... জানেন আমার ভাবিজিকে প্রায় চিকিৎসা না করেই মেরে ফেলল। সাধে কি আমার ভাইপো বিদেশ পালিয়ে বেঁচেছে,” আবার হোঁচট খেলেন আকাশচাঁদ। ঈষৎ বিরক্ত সুরে বললেন, “আপনি বারবার আমার পারসোনাল ব্যাপারে ঢুকে পড়ছেন কেন বলুন তো?”

“যাঃ বাবা, আপনি তো নিজে থেকেই বলছেন,” মিতিন মৃদু হেসে মোবাইলটা তুলে সময় দেখল, “আজ তা হলে চলি। দরকার পড়লে আবার যোগাযোগ করব।”

আকাশচাঁদ অল্প ঘাড় নাড়লেন। মিতিন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “আপনার কাকার সঙ্গে আলাপ হলে ভাল লাগত। তা তিনি তো বোধ হয় এখন এ বাড়িতে নেই...”

“কাকা কোনও বাড়িতেই নেই। উনি আছেন জৈন ধর্মশালায়। বড়বাজারে।”

“ওখানে গিয়েই ওঁর সঙ্গে দেখা করেন?”

“উনিও আসেন। প্রায় রোজই।”

“আপনি কাকার কথা খুব মেনে চলেন, তাই না?”

আচমকা একটা বেলাইনের প্রশ্নে আকাশচাঁদ কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। টুপুরও কম অবাক হয়নি। কী যে বলতে চায় মিতিনমাসি!

॥ ৫ ॥

দুপুরে মাসির বাড়ির খাওয়াটা মোটেই জমল না টুপুরের। আয়োজন অবশ্য মন্দ ছিল না। ঢাকুরিয়া বাজার থেকে একটা সোয়া কিলো ইলিশ মাছ এনেছিল মেসো। মাসির হাতে ট্রেনিং পাওয়া আরতিদি ভাপা ইলিশটা রেঁধেও ছিল আজ দারুণ। মাছের ডিম আর তেলের স্বাদটাও ছিল মনোহরণ। কিন্তু টুপুরের মুখে রুচলে তো। এমনকী, শেষপাতে সুরেশের অতি সুমধুর রাবড়ি পর্যন্ত জিভে পানসে ঠেকল। মন ভাল না থাকলে যা হয় আর কী। ফুচকাও তো তখন উদ্ভে। শালিনীর বাড়িতে বেইজ্জত হওয়াটা টুপুর কিছুতেই ভুলতে পারছে না যে। হ্যাঁ, বেইজ্জতই তো। আকাশচাঁদ যাই বলুন, শালিনীর সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়াটা অপমান হিসেবেই দেখছে টুপুর। মাসি সেই অপমানটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। গোদের উপর বিষফোঁড়া, শালিনীর বাবার সঙ্গে কেন যে অতক্ষণ ধরে হাবিজাবি বকল, সেটা পর্যন্ত টুপুরের কাছে ঝেড়ে কাশছে না। তা হলে মাসির বাড়িতে টুপুরের আর পড়ে থাকার দরকার আছে কি? বরং মেসোকে বললেই হয়, আজ বিকেলেই তাকে হাতিবাগানে পৌঁছে দিয়ে আসুক। বুধবার ম্যাথ্‌সের ক্লাসটেস্ট, কাল জন্মাষ্টমীর দিনটা না হয় পাটিগণিত-বীজগণিত কষেই কাটাবে।

কথাটা বলতেই ঘুমন্ত বুমবুমকে ডিঙিয়ে বিছানা থেকে নামল টুপুর। দরজা পর্যন্তও যায়নি, মেসোর গলা শুনে পা আটকে গেল।

পার্থমেসো বলছে, “তুমি তা হলে শিওর, আকাশচাঁদ জগৎ শেঠদের বংশধর?”

মিনিতনমাসির স্বর উড়ে এল, “টু হানড্রেড পারসেন্ট।”

“কিন্তু পরিচয় গোপন রাখতে চায় কেন?”

“রাখেনি তো। ভদ্রলোকের ফেসবুক প্রোফাইল তো বলেই দিচ্ছে উনি কে?”

“হাউ?”

“নাগৌর-পটনা-রাজমহল-মুর্শিদাবাদ-মহিমাপুরওংগঙ্গা...হিরা-মানিক-ফতে-আনন্দ-মহতাব-স্বরূপ-ওংগঙ্গা। এটাই তো যথেষ্ট।”

“হাউ?”

“হাউহাউ কোরো না। যা বলছি, মন দিয়ে শোনো। রাজস্থানের এক মরুদ্যান শহর নাগৌর। সেখান থেকে জৈন বণিক হীরানন্দ শাহ এসেছিলেন পটনায়। বাদশাহ শাহজাহানের আমলে। হীরানন্দের ছেলে মানিকচন্দ পটনা থেকে এলেন বাংলার তখনকার রাজধানী ঢাকা রাজমহলে। মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার নবাব হয়ে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেলেন মুর্শিদাবাদে, মানিকচাঁদও তার পিছু-পিছু সেখানে হাজির। ধানু ব্যবসায়ী মানিকচাঁদের কারবার ছড়িয়ে পড়ল দূরদূরান্তরে। বেনারস, ইলাহাবাদ, কোরা, জাহানাবাদ, আগ্রা ছাড়িয়ে সেই দিল্লি পর্যন্ত। বাদশাহ ফারুকশিয়ার তাঁকে দেন শেঠ খেতাব।”

“পরে সেটাই হয়ে যায় জগৎ শেঠ, তাই তো?”

“আজ্ঞে না স্যার। দিল্লিতে একটা বড় আকাল হয়েছিল। তখন বাদশাহর হয়ে অজস্র লোককে হুন্ডিতে টাকা ধার দিয়েছিলেন শেঠ মানিকচাঁদের দত্তকপুত্র ফতেচাঁদ। খুশি হয়ে বাদশাহ তাঁকে দিলেন জগৎ শেঠ উপাধি। বংশটার নামই হয়ে গেল জগৎ শেঠ। ওঁদের মতো টাকা তখন গোটা ভারতে একজন বণিকেরও ছিল না। ইংরেজ, ফরাসি, ডাচ কোম্পানিগুলোও তখন ধারের জন্য জগৎ শেঠের কাছে এসে হাত কচলাত। মুর্শিদাবাদের কাছে মহিমাপুরে প্রকাণ্ড এক প্রাসাদে বাস করতেন জগৎশেঠরা, ধনদৌলত তখন ও বাড়িতে উপচে পড়ত।”

“অ। সেইজন্য মহিমাপুর। কিন্তু ওংগঙ্গা কেন?”

“ওর পরেই সব ফুতুং হয়ে গেল কিনা। হয়তো সেটা বোঝাতেই...” মিতিন একটু থেমে আচমকা গলা ওঠাল, “দরজার ওপারে কেন, এখানেই চলে যায়।”

টুপুর পলক থতমত, তারপর পরদা সরিয়ে মাসির ড্রয়িংরুমে ঢুকেছে। গোমড়া গলায় বলল, “ভাবলাম তোমাদের জ্ঞানচর্চায় বিঘ্ন ঘটবে, তাই...”

“আড়াল থেকে তোমাদের কথা গিলছিলাম, তাই তো?” মিতিনের ঠোঁটে মুচকি হাসি, “তোকে একটা বেসিক টিপ্‌স দিই। আড়ি পেতে যখন কিছু শুনবি, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকবি। পরদার ওপারে দাঁড়িয়ে আছিস, অথচ পা দু'খানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এমনটা যেন আর না হয়।”

টুপুর মনে-মনে জিভ কাটল। মুখে অবশ্য বলল, “ওসব শিখে আমার কী হবে? তুমি তো আমায় অ্যাসিস্ট্যান্ট করছ না?”

"কী যুক্তিতে এমন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছলি?"

"তোমার অ্যাটিটিউডেই বোঝা যায়। তুমি আমার সঙ্গে কিছু আলোচনাই করতে চাইছ না।"

"খুব চটেছিস, অ্যা," মিতিন শব্দ করে হেসে উঠল, "ওরে বোকা, আমি তোকে নিজের মতো করে ভাবনা করার সময় দিলাম। যাতে তোর মনে রহস্যটা নিয়ে নানান প্রশ্ন উঠে আসে। ঘটনাপ্রবাহের অস্বাভাবিক অংশগুলো তোর নজরে পড়ে।"

"আমি তো তেমন কিছু দেখছি না। একমাত্র শালিনীকে লুকিয়ে রাখা ছাড়া।"

"কেন লুকিয়ে রাখলেন বলে তোর মনে হয়?"

"যাতে ওই উদ্ভট স্বপ্নটা নিয়ে কোনও কথা না ওঠে।"

"এমনটা আকাশচাঁদ ভাববেন কেন? আমি তো গিয়েছি অন্য প্রয়োজনে।"

"হয়তো শালিনী আগেই টুপুরের নামটা বাবাকে বলেছিল। কিংবা তোমরা যাবে শুনে জেরা করে শালিনীর মুখ থেকে জেনে গিয়েছেন, ঐন্দ্রিলা নামের মেয়েটা ওই ব্যাড ড্রিমটি সম্পর্কে অবহিত।" টুপুরের বদলে পার্থই যুক্তি খাড়া করল, "হয়তো উনি ভেবেছেন, শালিনী সামনে এলে ঐন্দ্রিলা, আই মিন টুপুর, হয়তো প্রসঙ্গটা তুলে বসতে পারে।"

"তো?"

"তাই টু বি অন দ্য সেফ সাইড, উনি শালিনীকে আড়ালে..."

"দাঁড়াও-দাঁড়াও, স্বপ্নটার একটা বিপদ ঘটার মতো সাইডও আছে তা হলে?"

"থাকতেও পারে। অন্তত শালিনীর বাবা তাই মনে করেন। শালিনীর দাদুটিও।"

"আমি তো সেই সাইডটাই খুঁজছি মশাই। আর সে ব্যাপারে ওই দাদুটির কী ভূমিকা, সেটাও আমাকে জানতে হবে।"

"কিন্তু কেন?" টুপুর অসহিষ্ণু হয়ে বলল, "এখানে তো কোনও ক্রাইমটাইমের ব্যাপার নেই মাসি।"

"শুধু অপরাধ আর ক্রিমিনালের সন্ধান করাই কি আমার থার্ড আইয়ের কাজ? যে-কোনও রহস্যের জট খোলাই তো তৃতীয় নয়নের লক্ষ্য," মিতিনের হাসি-হাসি মুখে পলকা ছায়া, "তা ছাড়া শিগগিরি একটা অপরাধ ঘটবে কিনা, সে সম্পর্কেও তো নিশ্চিত হতে চাই। কারণ, বিপদে যে পড়তে পারে, সে এক অতি নিরীহ বালিকা।"

টুপুর আশঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি শালিনীর কথা বলছ?"

"অবশ্যই। স্বপ্নটা সে দেখেছে যে এবং এখনও দেখছে। নিশ্চয়ই অকারণে নয়।"

মিতিন ভুরু কুঁচকোল। দেওয়াল ঘড়িটা দেখল এক ঝলক। আঙুল তুলে টুপুরকে বলল, "এই সময়টায় শালিনী সম্ভবত একা আছে। ওকে একটা মেসেজ কর তো।"

"কী লিখব?"

"বেশি কিছু নয়। লুকিয়ে ফোন কর, ভেরি আর্জেন্ট।"

"যদি উত্তর না আসে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছে, আসবে।"

"ধরো এলো, কী বলব?"

"সেটা তুই আমার উপর ছেড়ে দে। কথা তো বলব আমি।"

সন্দিগ্ধ চোখে মাসিকে দেখতে-দেখতে ঘর থেকে মোবাইলটা নিয়ে এল টুপুর। টুকটুক বোতাম টিপে রাখল পাশে। হৃৎপিন্ডে লাবডুব। এই বুঝি বেজে উঠল।

মিতিন হাসছে, "অত টেনশন করিস না। ওর একটু সময় লাগবে," বলেই পার্থর দিকে ফিরেছে। সহজ গলায় বলল, "আমাদের যেন কী নিয়ে কথা হচ্ছিল?"

পার্থর চোখ পিটপিট। একটু মাথা চুলকে বলল, "জগৎ শেঠ?"

"হ্যাঁ, জগৎ শেঠ। ওঁদের ধনরত্ন নিয়ে তো গল্পগাছা কম নেই। ব্যবসা শুরু নিয়েও উপাখ্যান আছে। হীরানন্দ শাহ নাকি পটনা এসেছিলেন প্রায় শূন্যহাতে। একদিন ঘুরতে-ঘুরতে পটনার কাছে এক জঙ্গলে ঢুকে দুপুরবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন হীরানন্দ, হঠাৎ ঘুম ভাঙে এক আর্তনাদ শুনে। শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে দ্যাখেন, কাছেই এক ভাঙাচোরা প্রাসাদ, তার অন্দরে এক অসুস্থ বুড়ো লোক যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। হীরানন্দ সেই বৃদ্ধের খুব সেবাশুশ্রূষা করেন। কিন্তু বুড়ো লোকটি বাঁচেননি। তাঁর সৎকার করার পর হীরানন্দ আবিষ্কার করেন, বিপুল টাকাপয়সা রেখে গিয়েছেন ভদ্রলোক।"

"বুঝেছি। সেই টাকা খাটিয়েই জগৎ শেঠদের রমরমা," পার্থ ঘাড় দোলাল। ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলে বলল, "আমাদের কপালে যে কেন এমন জোটে না?"

"সরি, তুমি ওই টাকা পেলে দু'মাসে উড়িয়ে দিতে স্রেফ খেয়ে-খেয়ে," মিতিন মুখ বেঁকাল, "হীরানন্দ কী করেছিলেন জান? গোটা টাকাটা একবারে নেননি। যতটুকুনি দরকার, শুধু ততটুকুনই নিয়ে যেতেন। খেপে-খেপে এসে।"

"যাই হোক, পরের টাকায় শেঠ বনায় কৃতিত্ব নেই।"

"অন্যের টাকার জোরে ওঁরা শেঠ হননি। ব্যবসাবুদ্ধির জোরে ওঁরা ধনী হয়েছিলেন। তখন মুর্শিদাবাদে ট্যাঁকশাল ছিল, সেখানে নিজস্ব মুদ্রা তৈরি করা হত নবাবের। ওঁরা ছিলেন তার কর্তা। নবাবের গোটা টাকাপয়সার জগৎটাই ছিল ওঁদের মুঠোয়। কত ধনসম্পদ ছিল ওঁদের বাড়িতে জান?"

"দশ লাখ? বিশ লাখ? পঞ্চাশ লাখ?"

"ওভাবে হিসেব হবেই না। চার সিন্দুক বোঝাই রৌপ্যমুদ্রা মজুত থাকত সর্বদা। এছাড়া ছিল দু' সিন্দুক সোনার মোহর। আরও চার সিন্দুক সোনা, রুপোর বাট, সিন্দুকভর্তি হিরে-জহরত। প্লাস, রাশি-রাশি মুক্তো। প্লাস চুনি দিয়ে তৈরি একটা লক্ষ্মীমূর্তি, জৈনগুরু ভগবান পার্শ্বনাথের একখানা স্ট্যাচু, পান্না দিয়ে তৈরি।"

"যাঃ মাসি। তুমি কিন্তু বাড়িয়ে-বাড়িয়ে বলছ, "টুপুর না বলে পারল না। অবিশ্বাসী সুরে বলল, "এত কিছু কারও থাকে নাকি?"

"সত্যিই ছিল রে। শুধু তাই নয়, মাত্র দু' পুরুষেই এই সম্পত্তি তৈরি করে ছিলেন জগৎ শেঠরা। নবাব, বিদেশি বণিক, দেশি জমিদার সকলে ছিল ওঁদের কৃপাপ্রার্থী। তবে বেশিদিন ভোগ করতে পারেননি। ফতেচাঁদের নাতি মহতাপচাঁদ পর্যন্ত জলুস ছিল, তারপর থেকেই পতন, শুধু পতন।"

"ঠিক হয়েছে," টুপুর চোখ ঘোরাল, "ওই জগৎ শেঠই না সিরাজদৌল্লার বিরুদ্ধে চক্রান্তের মূল পান্ডা।"

"হুম, অর্থবল ওঁরই সবচেয়ে বেশি ছিল কিনা। ইংরেজরা যে সিরাজকে হটিয়ে একদিন দেশটার রাজা হয়ে বসবে, আর সেই সঙ্গে তাঁদেরও কপাল পুড়বে, এতটা ওঁরা অনুমান করতে পারেননি। মিরকাশিম তো ওঁদের দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। মহতাপ আর তাঁর ভাই স্বরূপ, দু'জনকেই উনি মাঝগঙ্গায় ডুবিয়ে মারেন।"

"ইজ ইট?" পার্থর গলা দিয়ে বিস্ময় ঠিকরে এল, "জান থতম! ওই জন্যই ওংগঙ্গা!"

"ইয়েস, " মিতিন মাথা নাড়ল, "মহতাপচাঁদের ছেলে খুশলচাঁদ জগৎ শেঠ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু কোমরের জোর ভেঙে গিয়েছিল। আর দু'-তিন পুরুষ পর থেকেই তো ইংরেজের হাততোলা হয়ে জীবনধারণ। মাসোহারা মিলত যৎসামান্য, সেই টাকায়।"

"তুমি এত জানলে কোত্থেকে মাসি?" টুপুর কৌতূহলী, "ইন্টারনেট ঘেঁটে?"

"নো মাদমোয়াজেল। তার চেয়েও নির্ভরযোগ্য সোর্স।"

"সেটা কী?"

"কী নয়? কে," মিতিন ঠোঁট টিপে হাসছে, "সোর্সটা অবশ্য ডিক্লেয়ার করব না।"

"কেন?" পার্থ মুখ বেঁকাল, "সোর্স গোপন রাখাই বুঝি টিকটিকি সমাজে আইন?"

টুপুরও একটু ফুট কাটতে যাচ্ছিল, হঠাৎ পাশে রাখা মোবাইল সরব। মনিটরে শালিনীর নাম। বাটন টিপতে গিয়েও থমকাল টুপুর। নার্ভাস মুখে বলল, "ও মাসি, তুমি ধরবে না, আমি?"

"আমাকেই দে," মিতিন মোবাইলটা নিয়ে কানে চাপল। ফোনের মাইক্রোফোন চালু করে বলল, "হ্যালো, আমি শালিনীর সঙ্গে কথা বলছি তো?"

ওপারে ক্ষীণকণ্ঠ, শোনাই যাচ্ছে না প্রায়, "হ্যাঁ রে। আমি খুব সরি রে।"

"আমি ঐন্দ্রিলা নই শালিনী। আমি ঐন্দ্রিলার মাসি। মিতিনের গলা ভারী নরম, "সকালে আমিই তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম।"

সাড়াশব্দ নেই, মিতিন প্রায় ফিসফিস করে বলল, "তুমি এখন কোথায়?"

এবার অস্পষ্ট গলা শোনা গেল, "আমাদের ফ্লোরের করিডরে।"

"বাবা বাড়ি নেই?"

"ভাস্ট নাও বেরিয়ে গেলেন। বড়ে তাউজি, মানে আলোকচাঁদ আঙ্কেলের সঙ্গে।"

"উনি আজ এসেছিলেন বুঝি?"

"হ্যাঁ। অনেকদিন পর," শালিনীর অস্ফুট স্বর, "কিন্তু আপনি কেন ফোন করছেন?"

"আমি যা বলছি মন দিয়ে শোনো," মিতিনের স্বর সামান্য উঠছে, "আমি ইতিহাসের গবেষক নই, মনের গলিঘুঁজি ঘাঁটি। তোমার স্বপ্নটার মানে খুঁজছি।"

ওপ্রান্ত আবার চুপ। মিতিন একটু সময় নিয়ে বলল, "ভয় পেও না শালিনী। তুমি কি সত্যিই জানতে চাও, কেন দেখছ স্বপ্নটা?"

"চাই তো। কিন্তু..."

"এতে কোনও কিন্তু নেই শালিনী। ভয়টা পাচ্ছ তুমি, কষ্টটাও তো তোমারই হচ্ছে," মিতিনের গলায় স্নেহ, "দ্যাখো মেয়ে, তুমিও নিশ্চয়ই মন থেকে ভয়টাকে উপড়ে ফেলতে চাও, নয় কি?"

"হ্যাঁ চাই তো," একটু যেন সপ্রতিভ হয়েছে শালিনী।

"তা হলে যা-যা প্রশ্ন করব, মনে করে জবাব দাও তো। স্বপ্নটা প্রথম কবে দেখলে?"

"লাস্ট মানডে। না-না লাস্ট সানডে।"

"সেদিন কোনও স্পেশাল ইভেন্ট? তোমার ছোড়দাদু কি..."

"হ্যাঁ, সানডে সন্ধেবেলাতেই উনি আমাদের বাড়ি এলেন।"

"তুমি কি আগে কখনও ওঁকে দেখেছিলে?"

"না তবে অনেক গল্প শুনেছি।"

"কীরকম? একটা-দুটো গল্প কি শুনতে পারি?"

"উনি নাকি লেখাপড়ায় খুব ব্রাইট ছিলেন। একবার যা পড়তেন তাই নাকি ওঁর মেমারিতে রয়ে যেত। অনেক ভাষা জানতেন। ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি ছাড়া সংস্কৃত, ফারসি, উর্দু, জার্মান... উনি নাকি পাস্ট, প্রেজেন্ট সব দেখতে পান।"

"কে বলেছেন এসব?"

"বাবা। উনি ছোটো দাদাজিকে খুব রেসপেক্ট করেন।"

"ওর সঙ্গে তোমার বাবার যোগাযোগ আছে বুঝি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আছে তো। এভরি ইয়ার বাবা একবার ওঁর আশ্রমে যান। রাজস্থানে।"

"তুমি কখনও সেখানে যাওনি? আই মিন, তোমার বাবা নিয়ে যাননি তোমাকে?"

"না। উনি নাকি ফ্যামিলির লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে চান না।"

টুপুরের অবাক লাগছিল। কোনও জড়তা নেই, বেশ টকটক কথা বলছে শালিনী। মিতিনমাসি কি ভোজবাজিতে শালিনীর জড়তা কাটিয়ে দিল?

মিতিনমাসি জিজ্ঞেস করছে, "তা হঠাৎ উনি কলকাতায় চলে এলেন যে বড়?"

"বাবাই বোধ হয় কী এক জরুরি কারণে ওঁকে ডেকেছেন।"

"হুম। তো ছোটা দাদাজিকে দেখার জন্য, তুমি খুব এক্সসাইটেড ছিলে নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ, ছিলাম তো। অত স্টোরি শুনেছি, তিনি নিজে আমাদের ফ্ল্যাটে আসবেন..."

"সেদিন দাদাজি আসার পর কী-কী হল, একটু গুছিয়ে বলো তো।"

"দাদাজিকে দমদম এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে এলেন বাবা। আমি, মা, সবাই ওঁকে প্রণাম করলাম। মা কত কী বানিয়েছিলেন, উনি কিছু খেলেন না। একটা পুরনো বই ছিল ওঁর কাছে। বাবা আর উনি ওইটা খুলে কী সব কথা বলতে লাগলেন।"

"তোমার সঙ্গে কথা বলেননি?"

"হ্যাঁ। আমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে গল্প বললেন। আমি শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম। রাতে খাওয়ার জন্য মা যখন ডাকল, আহিরটাঁদজি চলে গিয়েছেন।"

"আর আসেননি উনি?"

"রোজ আসছেন। কাল রাতেও..."

আচমকা কুট করে কেটে গেল লাইনটা। টুপুর হাঁ। পার্থর ভুরু জড়ো।

মোবাইলটা নাড়াচাড়া করছে মিতিন। দৃষ্টি জানলার ওপারে। কী ভাবছে মাসি!

॥ ৬ ॥

সন্ধে নেমেছে কলকাতায়। দুপুর থেকেই আকাশে আজ মেঘেদের ঘনঘটা, কিন্তু বৃষ্টি নামছে না। হাওয়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। বিচ্ছিরি গুমোটে, প্যাচপ্যাচে গরমে, মানুষজনের প্রাণ যায়-যায় দশা।

টুপুরও ছটফট করছিল। শুধু গরমে নয়, টেনশনেও আবার ফোনটা তুলে রিং করল শালিনীকে। উহ্, আবার সেই সুইচড অফ ঘোষণা। নাহ্, ব্যাপারটা খুব খারাপ। মেয়েটাকে নতুন করে কেন যে জড়িয়ে দিল মাসি? ধরা তো পড়েছেই, ফ্ল্যাটের বাইরে এসে ফোন করার জন্য জোর বকুনিও খেয়েছে নির্ঘাত। স্বপ্নটা নিয়ে কেন যে এত কুস্তি লড়ছে মাসি?

টুপুর ঘরে ফের উঁকি দিল। এখনও বুমবুমকে হোমটাস্ক করাচ্ছে মাসি। ওকে পার্থমেসো একমনে একটা আদ্যিকালের পুরনো ফুটবল ম্যাচ দেখছে টিভিতে। আশ্চর্য, কারও কোনও তাপউত্তাপ নেই। ওই ঘটনার পরেও দিব্যি নাচতে-নাচতে মাটন রোল নিয়ে এল মেসো, টুপুরকে গপগপ করে তা খেতে হল। এদিকে যে টুপুর বন্ধুর চিন্তায় কত কাতর, তা কেউ বুঝতেই পারছে না।

মেসোর পাশে গিয়ে ধপাস করে বসল টুপুর। গুমগুমে গলায় বলল, "আমার বন্ধুটার যে কী হল, কে জানে!"

"কী আবার হবে?" পার্থ তেমন একটা আমল দিল না। হালকা ভাবে বলল, "বরং পেটের কথা বেশ খানিকটা উগরে দিতে পেরে সে হয়তো অনেকটা নিশ্চিন্ত এখন। তোর মাসি তাকে কত ভরসা দিল।"

"কিন্তু যেভাবে ফোনটা কেটে গেল..."

"তার একাধিক কারণ থাকতে পারে। হয়তো তক্ষুনি ওর ব্যাটারির চার্জ ফুরিয়ে গিয়েছিল কিংবা সার্ভিস-প্রোভাইডার কোম্পানিটির হয়তো ঠিক ওই মুহূর্তে সার্ভার বসে গেল।"

"কিন্তু তারপর থেকেই ফোন সুইচড অফ থাকবে কেন?"

"প্লেন অ্যান্ড সিম্পল। ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়ে সে বাবার আদেশমতো ফোনটি বন্ধ করে রেখেছে," পার্থ ঝুঁকল সামান্য, এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "হ্যাঁরে, তোর মাসির মাথাটা একেবারে গিয়েছে, তাই না?"

টুপুর সতর্ক স্বরে বলল, "হুঁ, মাসিকে স্বপ্নের কথাটা বলাই গোক্ষুরি হয়েছে।"

"হাতে এখন কেসটেস নেই তো, তাই জোর করে কেস বানানোর চেষ্টা চালাচ্ছে," পার্থ চোখ টিপল, "ভাব তুই, একটা স্বপ্নকে ধরে তার মধ্যে জগৎ শেঠ পরিবারকে এনে খানিক উত্তেজনার আগুন পোহানো ছাড়া আর কোনও লাভ আছে? কাল রাত্রে আমিও তো স্বপ্ন দেখেছি, আমি একটা নদীতে ডুবে যাচ্ছি, সেখানে গ্লেসিয়ারের মতো রাবড়ির মোটা-মোটা সর ভাসছে..."

"যাঃ, তুমি বানিয়ে বলছ..."

"নারে, সত্যি। আমি একটা সরের উপর উঠেছি, অমনি সরটা ডুবতে শুরু করল, আমি প্রাণপণে চেঁচাচ্ছি, কিন্তু গলায় আওয়াজ নেই..."

"তারপর উঠে বসে ঢকঢক করে জল খেলে, বিছানা থেকে নেমে ডাইনিংয়ে গিয়ে ফ্রিজ খুললে," মিতিন দরজায়, সেখান থেকেই টুপুরকে বলল, "তোর মেসোকে জিজ্ঞেস কর তো, ফ্রিজের রাবড়ির ভাঁড়টা তখনই অর্ধেক করেছিল কিনা?"

পার্থ ঘাড় চুলকোচ্ছে, "তখন তুমি জেগে ছিলে বুঝি?"

"আজ্ঞে না। তোমার অভ্যেস আর কার্যকারণ সম্পর্ক দিয়ে মেলালাম," মিতিন সোফায় এসে বসল, মোলায়েম সুরে বলল, "শালিনীর স্বপ্নটাও আমি ওভাবেই স্টাডি করছি মশাই।"

"টাইমপাস হিসেবে মন্দ কী!" পার্থর স্বরে বিদ্রুপ। রাতদুপুরে চুরি

ধরা পড়ে যাওয়ার ঝাল মেটাতে টকটক গলায় বলল, "শেষে কিন্তু অশ্বডিম্ব মিলবেই।"

মিতিন একটুও চটল না। হাসিমুখেই বলল, "আমাকে কয়েকটা জিনিস বুঝিয়ে দেবে?"

পার্থ টিভি অফ করে সিধে হয়ে বসল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "লেট মি ট্রাই।"

"যে সংসারত্যাগী মানুষটা আত্মীয়স্বজনদের দেখতে চান না, তিনি হঠাৎ উড়ে এলেন কলকাতায়। হ্যাঁ, উড়ে। ট্রেনে চেপে নয়। খরচের কথা এক্ষুনি ধরছি না। কিন্তু এত তাড়া কিসের?"

"শালিনী তো বলল, আকাশচাঁদ ওঁকে ডেকে এনেছেন।"

"ডাকতেই উনি চলে এলেন? যিনি বিশ বছর কলকাতার ছায়া মাড়ান না? এসেই চামড়া বাধাঁনো কিতাব খুলে জরুরি আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন দুই জৈন? যাঁদের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী? তারপরই নাতনিকে গল্প শোনাতে এগিয়ে এলেন, যে নাতনির সঙ্গে তাঁর পরিচয়ই নেই? গল্পটা কী নিয়ে তা জানি না। কিন্তু সেই গল্প শুনে সন্ধেবেলাতেই ঘুমিয়ে পড়ল শালিনী। আর সেই রাত থেকেই শুরু হল মেয়েটার দুঃস্বপ্ন।"

"ওটা কাকতালীয়। অন্য ঘটনাগুলোর সঙ্গে মেলাচ্ছ কেন?"

"মানতাম। যদি স্বপ্নটা গোপন রাখার জন্য আকাশচাঁদ আর আহিরচাঁদ মরিয়া হয়ে না উঠতেন। এমন স্বপ্ন যা রোজ রিপিট হয়। ঘটনাটা কি খুব স্বাভাবিক?"

পার্থ আর টুপুর চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। ঢোক গিলে পার্থ বলল, "দুনিয়ায় রোজ অনেক অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে। তার মানে এই নয় যে, পিছনে সর্বদাই একটা ক্রাইম হচ্ছে, বা হতে চলেছে।"

"এখানে কিছু একটা ঘটবেই, ইন ফ্যাক্ট হয়তো অলরেডি ঘটে গিয়েছে।"

"কী করে বলছ?" পার্থর স্বরে ফের ব্যঙ্গ, "তুমি কি জ্যোতিষচর্চা শুরু করেছ?"

"নো। জগৎ শেঠদের ইতিহাস যা বলছে..."

"অ্যাই বেশি বোকো না তো," পার্থর গলা সামান্য চড়ে গেল, "জগৎ শেঠদের হিস্ট্রি আমার ঘাঁটা হয়ে গিয়েছে। আকাশচাঁদ, শালিনীরা আদৌ জগৎ শেঠই নয়।"

"বটে," মুচকি হাসল মিতিন। বুমবুম ঘর থেকে বেরিয়ে জুলজুল চোখে বন্ধ টিভির দিকে তাকাচ্ছিল, তাকে কার্টুন চ্যানেল চালিয়ে দিয়ে সোফায় বাবু হয়ে বসে বলল, "তা কী জেনেছ একটু শেয়ার করা যাক।"

"তুমি তখন যে খুশলচাঁদের কথা বলছিলে, তিনি ছিলেন বেজায় খরুচে। জৈন মন্দির বানিয়ে আর দানধ্যান করেই জগৎ শেঠদের সম্পত্তি প্রায় লাটে তুলে দিয়েছিলেন। এমন হাল হয়েছিল, ইংরেজদের কাছে মাসখরচ চাইতে শুরু করেন। বছরে তিন লাখ টাকা বরাদ্দ করেছিল ইংরেজ, নেননি খুশলচাঁদ। কারণ, তাঁর মাসিক খরচই ছিল একলাখ টাকা।"

"বলো কী?" টুপুরের চোখ কপালে,"তখনকার একলাখ মানে তো এখনকার কোটি টাকার সমান।"

"তার চেয়েও ঢের-ঢের বেশি। ওই টাকা উড়িয়েই তো ফৌত হয়েছিলেন," পার্থর ঠোঁটে তেরচা হাসি, "খুশলচাঁদের পর এলেন হারাকচাঁদ, তারপর ইন্দ্রচাঁদ, দেন গোবিন্দচাঁদ। তিনিও ছিলেন টাকা ওড়ানোর মাস্টার। জগৎ শেঠদের যেখানে যা সম্পত্তি ছিল, সব বেচেবুচে দিয়ে তাঁর প্রায় নাঙ্গা ফকিরের দশা। মাত্র বারোশো টাকা ভিক্ষে দিত ইংরেজরা, শেষে সংসার চালাতে তাই নিতেন হাত পেতে। তিনি মারা যেতে মাসোহারা গেল তাঁর খুড়তুতো ভাই কিষনচাঁদের হাতে, টাকার পরিমাণ তখন আটশো। তার আবার এক ভাগীদার জুটল গোপালচাঁদ, ওই টাকা থেকে তিনশো চলে গেল তার গব্বায়। ভাব তুই?"

"হু," টুপুর মাথা দোলালো, "খুবই করুণ।"

"আরও আছে। গোপালের পর নামকাওয়াস্তে জগৎ শেঠ হলেন গোলাপচাঁদ, আঠারোশো সাতানব্বইয়ের ভূমিকম্পে তাঁদের মহিমাপুরের বাড়ি, মন্দির সব ধুলিসাৎ। ইংরেজদের সাহায্য নিয়ে আবার বাড়িটাড়ি হল বটে, কিন্তু তখন জগৎ শেঠ পরিচয় দিলে লোকজন হাসে।"

"যেমন কর্ম তেমনি ফল। সিরাজদৌল্লার সঙ্গে বেইমানি করে ইংরেজকে রাজা বানানোর উচিত শাস্তি।"

"সবাই তাই বলে। নিয়তিই নাকি সাজা দিয়েছে বংশটাকে। ...যাই হোক গোলাপচাঁদের ছেলে দ্বিতীয় ফতেচাঁদেরও মৃত্যু ঘটেছে বছরপঞ্চাশ আগে, মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে," পার্থ ঘাড় বেঁকিয়ে মিতিনের দিকে তাকাল, "আমার ফান্ডায় কিছু ভুল আছে?"

"নাঃ, মোটামুটি কারেক্ট।"

"ভাঙবে, তবু মচকাবে না। এবার এটুকু তো মানবে, দেড়শো বছর আগে বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রিটে যাঁরা বাড়ি বানিয়েছিলেন, তাঁরা কোনও ভাবেই জগৎ শেঠ নন।"

"সরি। মান্য গেল না।"

"কেন-কেন-কেন?"

কারণ, এত খেটেখুটে তুমি শুধু ইতিহাসের অর্ধেকটা জেনেছ। আকাশচাঁদ শেঠদের পরিবারটা আছে ইতিহাসের বাকি অর্ধেকটায়। বলতে পার চাঁদের উলটো পিঠে।"

"বুঝলাম না," পার্থর চোখ পিটপিট। সন্দিগ্ধ স্বরে বলল, "কোনও আষাঢ়ে গল্প ফাঁদবে না তো?"

"উহু," মিতিন হাসতে-হাসতে বলল, "জান কি, খুশলচাঁদের এক ভাই ছিল। উদয়চাঁদ। তাঁর বংশধররা জগৎ শেঠ উপাধি পাননি ঠিকই, কিন্তু তাঁরাও তো ওই পরিবারের অংশ। জগৎ শেঠ বলে তাঁরা পরিচয় দেন না, কিন্তু ওই বংশের সৌভাগ্যের ভাগ তাঁরাও পেয়েছেন। এমনকী, জগৎ শেঠদের কিছু-কিছু বিশেষ সম্পদ এঁদের কাছে গচ্ছিত রয়ে গিয়েছে।"

"তোমায় কে বলল এটা?" পার্থ শ্লেষের সুরে বলল, "তোমার সেই সোর্স?"

"ধরো তাই। অনেক দলিলদস্তাবেজ ঘেঁটে তিনি জানাচ্ছেন, মূল জগৎ শেঠ পরিবার যখন ক্রমশ ডুবছে, এঁদের রমরমা তখন হু হু করে বেড়েছে। মূলধন কোথা থেকে পেয়েছিলেন সেটাই রহস্য। সেই বিষয়ে অবশ্য নানান জনশ্রুতি আছে। কোথাও বলা হচ্ছে, জগৎ শেঠদের অনেক লুকনো সোনাদানা এঁদের হাতে এসে গিয়েছিল, কোথাও বা বলা হয়েছে..."

"তোমার গল্পে আমি নট ইন্টারেস্টেড। যদি কোনও বিশ্বাসযোগ্য ডকুমেন্ট থাকে তো বলো, নয়তো মুখে কুলুপ আঁটো।"

গোমড়া গলায় কথাগুলো ছুড়ে দিয়ে পার্থ কার্টুনে মন দিয়েছে। মিতিন ভুরু কুঁচকে নখ খুঁটছে। একবার মোবাইলটা হাতে নিয়েও রেখে দিল। উঠে জানলায় গিয়ে দাঁড়াল একটু, আবার এসে বসল সোফায়। বোঝাই যায়, মনের মধ্যে চিন্তার ঘূর্ণিপাক চলছে। কিন্তু কী নিয়ে? পার্থমেসোর জন্য লাগসই উত্তর খুঁজছে মিতিনমাসি? নাকি শালিনীকে নিয়ে এতক্ষণে ভাবিত হয়েছে মাসি?

টুপুর বুঝতে পারছিল না। মাসিকে প্রশ্ন করতেও মন থেকে সাড়া পাচ্ছে না। অগত্যা টিভিতেই চোখ রাখল। কার্টুনের প্রোগ্রামটা শেষ হল, বিজ্ঞাপন স্টার্ট। রিমোটে খেলার চ্যানেলে গেল মেসো। সেখানে এখন গল্‌ফ। পাশের চ্যানেলে বাস্কেটবল। পছন্দের খেলা না হলে আঙুল স্থির থাকে না মেসোর। ঘুরে এবার খবরের চ্যানেল। কোথায় যেন কী একটা চুরি হয়েছে, শুভ্রবসন সৌম্যদর্শন এক প্রবীণ অভিযোগ জানাচ্ছেন বুমধারী সাংবাদিককে। পার্থমেসো ফের চ্যানেল ঘোরাতে যাচ্ছিল, হঠাৎ হাঁ হাঁ করে উঠল মাসি, "আহ্, থামো না। খবরটা একটু দেখি।"

থমকেছে পার্থ। কয়েক সেকেন্ড পরে তারও চোখ গোলগোল এবং টুপুরেরও। অভিযোগকারী ভদ্রলোকের নাম আহিরচাঁদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শালিনীর ছোড়দাদুর নামও তো তাই। তিনিই নন তো।

হ্যাঁ তিনিই। চুরিটা হয়েছে বড়বাজারের জৈন ধর্মশালায়। আহিরচাঁদের কক্ষে। বিকেলে বেরিয়ে কাছেই একটা জৈন মন্দিরে গিয়েছিলেন আহিরচাঁদ, ফিরে দেখেন দরজা খোলা। ঘরে একটি বহুমূল্য ভগবান পার্শ্বনাথের মূর্তি ছিল। সেটি গায়েব। মূর্তিটি নাকি হাজার বছরের পুরনো, চোখের মণিদুটো পান্নার। পুলিশ এসে অকুস্থল পরিদর্শন করে গিয়েছে একটু আগে। জোরকদমে নেমে পড়েছে তদন্তে। কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

কয়েক সেকেন্ড ঘরে অখণ্ড নীরবতা। তারপরই পার্থর গলাই বেজে উঠল সবার আগে, "কী হল ব্যাপারটা? হঠাৎ একটা মূর্তি চুরি হয়ে গেল?"

টুপুর বলল, "অত দামি মূর্তি ওঁর কাছে এল কীভাবে?"

পার্থ বলল, "ওই জৈন ধর্মশালা আমি চিনি। যথেষ্ট ভদ্রসভ্য জায়গা। উটকো লোক তো ওখানে এন্ট্রি পায় না।"

টুপুর বলল, "আমার মনে হচ্ছে, ওই ধর্মশালার কোনও স্টাফ জড়িত। আগেই দেখে রেখেছিল, তক্কে-তক্কে ছিল। আজ সুযোগ মিলতেই হাপিস করে দিয়েছে।"

পার্থ বলল, "হুঁ, ওদের কাছে তো রুম-কি থাকেই।"

টুপুর বলল, "কী গেরো বলো তো, সেই কোন রনকপুর থেকে এসে কলকাতায় মূর্তিটা খোয়ালেন। কলকাতার বদনাম হয়ে গেল!"

চুপচাপ শুনছিল মিতিন, হঠাৎ ঝেঁজে উঠল, "তোদের বোকা-বোকা গবেষণাগুলো থামাবি? বুঝতে পারছিস না কমপ্লেন্টটায় গড়বড় আছে?"

টুপুর ফ্যালফ্যাল করে তাকাল,"কেন?"

"আহিরচাঁদ একজন সন্ন্যাসী। তাঁর কাছে পার্শ্বনাথের বিগ্রহ হারানোটাই মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর হওয়া উচিত। উনি কিন্তু বারবার সাংবাদিককে মূর্তির দামটা বোঝানোর চেষ্টা করছেন।"

"হয়তো পুলিশের উপর চাপ তৈরি করতে চাইছেন," পার্থ বলল, "দামি জিনিস হলে তবেই না পুলিশের টনক নড়ে।"

"উঁহু, আমি আঁশটে গন্ধ পাচ্ছি।" মিতিন মোবাইল ফোন হাতে নিল। একটা নম্বর টিপে চাপল কানে, "অনিশ্চয়দা, জৈন ধর্মশালার মূর্তিচুরির কেসটা দেখছিলাম। খুব সিম্পল নয়। আমি আপনাদের সঙ্গে...হ্যাঁ, আমি পারসোনালি আগ্রহী..."

কী কাণ্ড। খোদ ডি সি ডি ডি অনিশ্চয় মজুমদারকে ফোন! স্বপ্ন আর চুরি...কোনও সম্পর্ক আছে নাকি!

॥ ৭ ॥

সকাল হতে না-হতেই মিতিনের ব্যস্ততা বেড়ে গিয়েছে হঠাৎ। টুপুরকে ডাকাডাকির বালাই নেই, ঘুম থেকে উঠেই কোথায় না-কোথায় বেরিয়ে গেল। ফিরেই ঝুমঝুমকে বিছানা ছাড়াল, সে মুখ ধুতে না-ধুতেই তার হাতে ধরিয়ে দিল দুধের গ্লাস। ঝটাঝট ফোন করল বেশ কয়েকখানা, স্মার্টফোনে নিবিষ্ট হয়ে ঘটিল কী যেন, তারই মধ্যে আরতিকে জলখাবার তৈরি করার তাড়া লাগাচ্ছে। টুপুর আর পার্থকে তৈরি হয়ে নিতে বলল চটপট, কারণ জিজ্ঞেস করতে গিয়ে একচোট ধমক খেল পার্থ। ফ্রেঞ্চটোস্ট আর কফি শেষ হতেই সে সালোয়ার-কামিজ পরে প্রস্তুত, পার্থকে গাড়ি বের করতে বলে আবার কাকে যেন ফোন করছে।

মাসির এই ব্যস্ত রূপটা টুপুরের দারুণ প্রিয়। বুঝতে পারে মাসির মগজটা এখন প্রবল সক্রিয়, নিজের মস্তিষ্কের সঙ্গে তাল রাখতেই বেজায় ছটফট করছে মাসি। মনে-মনে একটা কিছু আঁচ করে নিয়েছে, এবার শুধু ধাপে-ধাপে সেটাই মেলানোর পালা। এক্ষুনি জিজ্ঞেস করে কোনও লাভ নেই, জবাব মিলবে না, সুতরাং নীরবে মাসির কাজকর্ম দেখে যাওয়াই ভাল।

অবশ্য তাড়াহুড়োর ফাঁকে সকালের খবরের কাগজটায় চোখ বুলিয়ে নিয়েছে টুপুর। জৈন ধর্মশালার চুরির ঘটনাটা মোটামুটি ফলাও করেই বেরিয়েছে। চুরি যাওয়া পার্শ্বনাথের মূর্তিটা নাকি রনকপুর হতে

~ www.amarboi.com ~

প্রায় দেড় কেজি, দু'চোখে দু'খানা পান্না বসানো আছে, তার দামও নেহাত কম নয়। তা ছাড়া বেশ প্রাচীন বলে একটা ঐতিহাসিক মূল্যও আছে মূর্তিটার। পুলিশ যথেষ্ট তৎপর, কালই ধর্মশালার এক কর্মচারীকে সম্ভাব্য চোর হিসেবে গ্রেফতার করেছে। তবে মূর্তিটার কোনও হদিশ মেলেনি এখনও।

বুমবুমেরও আজ স্কুল বন্ধ। জন্মাষ্টমীর ছুটি। তাকে অঙ্ক করতে বসিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল মিতিন। টুপুর আগেই গাড়িতে, পার্থমেসোর পাশে।

পার্থ স্টার্ট দিল গাড়িতে। নীরবে চালাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কোনও ব্যাপারেই যেন তার আগ্রহ নেই। গাড়ি গলি ছেড়ে মেনরোডে, অমনি মিতিনের স্বর শোনা গেল, "প্রথমে আমরা সোজা বড়বাজার যাব।"

পার্থর গলা থেকে একটা সংক্ষিপ্ত ধ্বনি ঠিকরে এল, "হুম।"

"বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই, আমাদের গন্তব্যস্থল জৈন ধর্মশালা।"

"আমার বোঝাবুঝির কোনও প্রয়োজন আছে কি?" পার্থর গলা আরও গোমড়া শোনাল, "ধর্মশালায় যাও, পাঠশালায় যাও, আমার কী?"

"এখনও চটে আছ," মিতিন ফিক করে হাসল, "আরে বাবা, মেজাজ গরম থাকলে আমাকে হেল্প করবে কীভাবে?"

"আমার মতো গোবরগণেশের সাহায্যের কোনও দরকার আছে কি?"

"লাগে-লাগে, কাজে লাগে বইকী," মিতিন ঠোঁট টিপে হাসল, "এক-আধটা বোকাসোকা লোক পাশে না থাকলে চলে? বুদ্ধিমানদের তা হলে সার্ভিস দেবে কারা?"

পার্থ রাগে ফেটে পড়তে যাচ্ছিল, হঠাৎ কী ভেবে তার ভুরুতে ভাঁজ। সন্দিগ্ধ স্বরে বলল, "তুমি আমায় ইচ্ছে করে তাতাচ্ছ, তাই না?"

"যাক, ঘটে ঢুকেছে এতক্ষণে। এবার আন্দাজ করো দেখি, তোমাকে আজ প্রেসে যেতে না দিয়ে টেনে আনলাম কেন?"

গাড়ি চালাতে-চালাতে গর্বিত স্বরে পার্থ বলল, "আত্মবিশ্বাস বাড়াতে।"

"ভুল অনুমান। নেক্সট গেস।"

"মূর্তিটা খুঁজতে আমার টিপ্‌স কাজে লাগাবে?"

"নো চান্স। খুবই মোটা দাগের কাজে তোমাকে লাগাব আজ। দেখি, তার মধ্যেই তোমার বুদ্ধির ছাপ রাখতে পার কিনা।"

"মানে? কী করাতে চাও আমাকে দিয়ে?"

"খুব সিম্পল জব। আমি আর টুপুর যখন আহিরচাঁদজির সঙ্গে মোলাকাত করব, সেই সময়টায় তুমি অন্যদের জবানবন্দিগুলো নোট করে ফেলবে। ইন ডিটেল।"

"যা থেকে তুমি মূর্তিচুরির কেসটা সল্‌ভ করতে পার, তাই তো?"

সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিল না মিতিন। ঘাড় হেলিয়ে দেখছে কাচের বাইরেটা। সকাল দশটার কলকাতা, পথেঘাটে থিকথিকে ভিড়। খানিকক্ষণ সেই এলোমেলো জনতার দিকে তাকিয়ে থেকে আবার ফিরিয়েছে মুখ। ঠান্ডা গলায় বলল, "একটা কথা তোমাদের দু'জনকে বলে রাখা ভাল। মূর্তিচুরির কেসটা সমাধান কিন্তু আমার মূল লক্ষ্য নয়।"

"তবে?" টুপুর আর পার্থর গলা একসঙ্গে বেজে উঠল, "আমরা তা হলে যাচ্ছি কেন?"

"শালিনীর স্বপ্নটার অর্থ উদ্ধার করতে।"

টুপুর ফ্যালফ্যাল চোখে পার্থর দিকে তাকাল। পার্থর দৃষ্টিও কেমন বিস্ফারিত। মিতিনের কথার মানে উদ্ধার করতে বেহাল দু'জনে। তবু সাহস করে প্রশ্ন করতে পারছে না কেউ। পাছে বোকা প্রতিপন্ন হতে হয়।

মিতিনও কিছু ভাঙল না। মোবাইল ফোনে কী যেন খুঁজছে মন দিয়ে। যানজট কাটিয়ে-কাটিয়ে পার্থ মহাত্মা গাঁধী রোডে ঢুকে পড়েছে। একজায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে গলাখাঁকারি দিল, অমনি মিতিনও সজাগ। মোবাইলকে ঘুম পাড়িয়ে নেমে এল। দেখাদেখি টুপুরও।

রিকশা, ঠেলা, মানুষের উথালপাথাল ঢেউয়ে টলমল করছে বড়বাজার। শহরের অজস্র ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। এই ব্যস্ত সময়ে বাস-ট্রাম-ট্যাক্সি-প্রাইভেট গাড়ি যেন একটু ঠাঁই পাওয়ার জন্য গুঁতোগুঁতি করছে আদ্যিকালের রাস্তাটায়।

পার্থ ঈষৎ উদ্বিগ্ন মুখে বলল, "আমাদের বাহনটি যে কোথায় পার্ক করি?"

মিতিন তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, "এখানেই থাক।"

"রাস্তাটা তো চওড়া নয়। পুলিশ যদি ঝামেলা করে?"

"কেউ কিচ্ছুটি বলবে না মশাই। বড়বাজার থানাকে খবর দেওয়া আছে। সো, এটাও আজ পুলিশের গাড়ি। আর সময় নষ্ট কোরো না, লক করে নিশ্চিন্তে চলে এসো।"

এই না হলে মিতিনমাসি। পাছে উটকো অশান্তিতে পড়তে হয়, আগেভাগেই মাসি আটঘাট বেঁধে নেয়।

পাশেই জৈন ধর্মশালা। গাড়িবারান্দাওয়ালা বেশ বড়সড় পুরনো ধাঁচের বাড়ি। তিনধাপ সিঁড়ি উঠে পিতলবসানো প্রকাণ্ড কাঠের দরজা। খোলা দরজার ওপারে ডাইনে এক কাচঘেরা ঘর, সেখানে বসে হিন্দি খবরের কাগজ পড়ছেন এক ফরসা প্রৌঢ়। গলা বাড়িয়ে নিচুস্বরে তাকে কী যেন বলল মাসি, অমনি প্রৌঢ় তটস্থ। কাগজ মুড়ে রেখে হন্তদন্ত পায়ে হাঁটা দিলেন সিঁড়ির পানে। সামান্য দুলে চলেছেন উপরতলায়।

টুপুর সামনের খোলামতো জায়গাটা দেখছিল। প্রাচীন হলেও জীর্ণ অপরিচ্ছন্ন নয় বাড়িটা, বরং একটা হালকা সুগন্ধ ভাসছে বাতাসে। দেওয়ালে একটা পিতলের বোর্ডে হিন্দিতে সার-সার নাম, পাশে টাকার অঙ্ক। এঁদের অর্থেই গড়ে উঠেছে ধর্মশালাটি, সম্ভবত দেখভালও হয় এঁদের পয়সায়।

নামগুলো পড়তে-পড়তে টুপুর বলল, "একজনও তো বাঙালি নেই।"

"থাকবে কোত্থেকে?" পার্থর টুকুস মন্তব্য, "জৈনধর্মটাই তো রাজস্থানিদের। আরও সঠিকভাবে বলা যায়, মারোয়াড়িদের।"

"একদম ভুল ধারণা," মিতিন ঝটিতি প্রতিবাদ জুড়ল, "ভারতের প্রায় সব প্রদেশেই অল্পবিস্তর জৈন আছেন। তাঁরা সকলে মোটেই রাজস্থানের লোক নন। তামিল, কর্নাটকিদের মধ্যে একসময় ভাল প্রচার হয়েছিল ধর্মটা। ওঁদের অনেক রাজামহারাজাও তখন জৈন ছিলেন যে। এমনকী, আমাদের এই বাংলাতেও হাজারদুই বছর আগে বেশ রমরমা হয়েছিল জৈনধর্মের। বিশেষত, পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-বীরভূম অঞ্চলে।"

"এখন তো চিহ্নই নেই," পার্থর স্বরে অবিশ্বাস প্রকট, "সেই জৈনরা সব উবে গেল নাকি?"

"প্রায় তাই," মিতিন সায় দিল, "বৌদ্ধ আর হিন্দু রাজাদের চাপে পড়ে জৈন ধর্ম এ রাজ্য থেকে পিঠটান দিয়েছিল। আবার ফিরল মাত্র তিনশো বছর আগে। রাজস্থানি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। আমরাও অমনি ধরে নিলাম, ধর্মটা শুধু ওদেরই।"

মিতিন সিঁড়ির দিকে তাকাল। আপনমনেই বলল, "মহাবীর জৈনদের একজন প্রধান ধর্মগুরু। তিনি জন্মেছিলেন বিহারে, রাজস্থানে নয়। সুতরাং..."

আর এগোতে পারল না মিতিন, ভদ্রলোক ডাকছেন ইশারায়। কাছে যেতেই মিতিনকে বললেন, "বেশিক্ষণ টাইম লিবেন না প্লিজ।"

মিতিন কপাল কুঁচকাল, "আহিরচাঁদজি কোথাও বেরোবেন নাকি?"

"ও বাত জানি না। আমি শুধু ওর ইচ্ছেটা জানালাম।" ভদ্রলোক মিতিনদের আর-একবার জরিপ করলেন। মৃদু আপত্তির সুরে বললেন, "আপনারা সবাই ওঁর ঘরে যাবেন?"

AMARBOI.COM

"না। ওরা দু'জন যাক," আগ বাড়িয়ে বলল পার্থ, "আপনাতে-আমাতে ততক্ষণ না হয় গল্প করি।" ভদ্রলোকের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য তিলমাত্র বিলম্ব করল না মিতিন, ঘরের নম্বর জেনে নিয়েই হরিণপায়ে উঠে গিয়েছে দোতলায়। লম্বা করিডরের দু'পাশে সার-সার ঘর, বাঁদিকের শেষ দরজার সামনে গিয়ে থামল। সামান্য গলা উঠিয়ে বলল, "ভিতরে আসতে পারি?"

একটা জলদগম্ভীর স্বর ভেসে এল, "আসুন।"

টুপুর অবাক। কাল টিভিতে মোটেই গলাটা এমন ভারী শোনাচ্ছিল না তো? জৈন সাধুটি কি নিজেকে ওজনদার করতে চাইছেন? কণ্ঠের ভারে?

দরজা ঠেলে ঢুকল মিতিন। টুপুরও। একেবারেই বাহুল্যবর্জিত রুম। খাট, ছোট একখানা কাঠের আলমারি আর একসেট চেয়ার-টেবিল। মেঝেয় একফালি সাদা কার্পেট, ওটুকুই যা বিলাসিতার উপস্থিতি।

আহিরচাঁদ বসে আছেন শুভ্র বিছানায়, পদ্মাসনে। পরনে সাদা ধুতি, খালি গা। তাঁর চোখজোড়া তিলেক মিতিনকে দেখল, ঝলক টুপুরকে। বিশুদ্ধ বাংলায় বললেন, "কলকাতা পুলিশের অনেক উন্নতি হয়েছে তো? বারো-তেরো বছরের মেয়েদেরও তদন্তে পাঠায়।"

মিতিন নম্র ভাবে বলল, "আমি পুলিশ নই। আমি পেশাদার গোয়েন্দা, এ আমার সহকারী। আমরা পুলিশকে সাহায্য করছি মাত্র।"

"অ। তা পুলিশকে তো আমার স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে। নতুন আর কী বলব?"

"যেমন ধরুন, অত দামি একটা মূর্তি আপনি কেন সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিলেন?"

"আইনগত কোনও বাধা আছে কি? আমি তো যদ্দুর জানি, নেই।"

"ততক্ষণই নেই যতক্ষণ না কোনও অপরাধ ঘটছে। আই মিন, যদি মনে হয় যিনি মূর্তি নিয়ে ঘুরছেন, তাঁর কোনও অসৎ উদ্দেশ্য আছে। যেমন ধরুন চোরাচালান, বা বিদেশে পাচার..."

"আপনার স্পর্ধা তো কম নয়," স্থৈর্য ভেঙে স্বর চড়ে গেল আহিরচাঁদের, "জানেন আমি কে? জৈন সমাজে আমার কোথায় স্থান? আমাকে আপনি চোরবাটপাড়দের সঙ্গে এক আসনে বসাচ্ছেন?"

"ছি ছি তা কেন? আমি শুধু একটা সম্ভাবনার কথা বলছিলাম," মিতিনের কণামাত্র উত্তেজনা নেই। ঠান্ডা স্বরে বলল, "আপনার তা হলে বদ মতলব কিছু ছিল না? এমনি-এমনিই মূর্তিটা নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন? যেমন-তেমন বেড়ানো নয়, দীর্ঘ কুড়ি বছর পর কলকাতায় আসা। খুবই মামুলি ঘটনা, নয় কী?"

কটমট চোখে মিতিনকে দেখলেন আহিরচাঁদ। সামান্য গলা নামিয়ে বললেন, "আমি মূর্তিটা একটা বিশেষ কাজে এনেছিলাম।"

"একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন, সেখানে পার্শ্বনাথের মূর্তিটা বিরাজ করবে। তাই তো?"

"আপনি জানলেন কী করে?" আহিরচাঁদের গলা দিয়ে বিস্ময় ঠিকরে এল, "আমি তো পুলিশকে একথা বলিনি।"

"আমি এও জানি, পার্শ্বনাথের মূর্তিটি ছিল আপনার রনকপুরে। মানে, অম্বামাতার মন্দিরের পাশে যে জৈন আশ্রমটিতে আপনি এখন অবস্থান করেন, সেখানে। কিন্তু মূর্তিটি ওই মনোরম পরিবেশ থেকে এনে হঠাৎ কলকাতায় বসানোর জন্য কেন ব্যগ্র হয়ে পড়লেন, সেটা কিন্তু এখনও ধাঁধা," মিতিনও স্বর নামাল, "আপনি কি সমাধানটা বলবেন?"

"না, মানে...আমাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল..."

"কে আপনাকে কথা দিয়েছিলেন? আপনার কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়?"

চমকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন আহিরচাঁদ। জবাব নেই।

"আমি কি একটু ধরিয়ে দেব?" মিতিনের স্বর মিহি, "আকাশচাঁদ, না আলোকচাঁদ?"

আহিরচাঁদ ক্ষিপ্ত স্বরে বললেন, "আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই।"

"এতে কিন্তু আপনার সুবিধেই হত। হয়তো মিলে যেত আপনার পার্শ্বনাথ।"

"আমার চাই না ফেরত," আহিরচাঁদ প্রায় ফেটে পড়লেন, "আমার ওই মূর্তিতে আর কোনও আগ্রহ নেই। যেখানকার জিনিস, সেখানেই ফেরাতে চেয়েছিলাম। পার্শ্বনাথজি বোধ হয় তা চান না।"

"নাকি আরও বড় কিছু চাইছেন পার্শ্বনাথ?" মিতিনের ঠোঁটে বাঁকা হাসি, "এবং তার সন্ধান মিলতে চলেছে?"

"আপনি বড্ড বাজে বকছেন।" আচমকা পদ্মাসন ছেড়ে খাট থেকে নেমে এলেন আহিরচাঁদ। সৌম্য মুখখানিও সহসা রুক্ষ, "আপনি এবার আসুন। বললাম তো, ওই মূর্তি আমি আর চাই না।"

"সে বললে হয়?" আহিরচাঁদজির রাগকে গ্রাহ্য করল না মিতিন। অচঞ্চল ভঙ্গিতে বলল, "জানেনই তো, বাঘ ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ। সেই পুলিশ কেস যখন হয়েছে, তার শেষ তো আপনাকে দেখতেই হবে গুরুজি।"

আহিরচাঁদের মুখমণ্ডলে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। টকটকে গৌরবর্ণ কপালে চিন্তার ভাঁজ।

হঠাৎ মিতিনের স্বর অস্বাভাবিক নরম, "আমি কি আপনাকে অন্য বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারি?"

"কীরকম?"

"যেমন ধরুন, লেখাপড়ায় তো আপনি দারুণ চৌকস ছিলেন। সব ছেড়েছুড়ে হঠাৎ সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন কেন?"

প্রশান্তি ফিরেছে আহিরচাঁদের। স্মিতমুখে বললেন, "ধর্ম আমাকে টানল যে।"

"কীভাবে?"

"আমাদের পুরনো পুঁথি পড়ে। সেখানে স্পষ্ট ভাবে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা আছে, আমাদের জ্ঞান কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। যতই চেষ্টা করি না কেন, জ্ঞান হবে অন্ধের হাতি দেখার মতো। আংশিক। তাই ওই পথ পরিত্যাগ করে নিজেকে ভগবান পার্শ্বনাথের চরণে

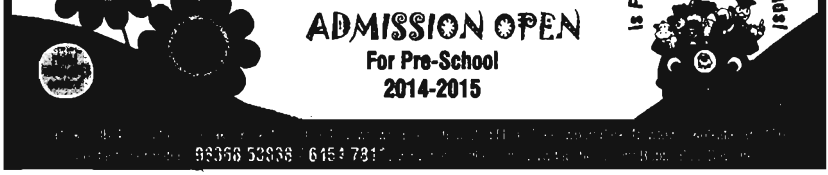

নিবেদন করে দিলাম। আমার জ্ঞানচর্চা অসমাপ্ত রইল বটে, কিন্তু মনের শান্তি তো মিলল।"

"হুম! আপনার বাংলাটি কিন্তু চমৎকার। এত বছর দেশের বাইরে, তবু কী নিখুঁত!"

"ভাষাজ্ঞান আমার বরাবরই উচ্চমানের। গর্ব করছি না, আমি যে ভাষা একবার শিখেছি, আমার মধ্যে সেটি গেঁথে গিয়েছে।"

"আপনি তো ভাল ফারসিও জানেন, তাই না?"

"অবশ্যই," বলেই যেন জোর হোঁচট খেলেন আহিরচাঁদ, আমতা-আমতা করছেন হঠাৎই, "না, মানে এখন আর তেমন চর্চা নেই..."

"তা বটে। আবার মূল কথায় আসি," মিতিনের গলায় ফের কেজো সুর, "কাল বিকেলে আপনি ঠিক চারটেয় বেরিয়েছিলেন, তাই তো? আর ফিরেছিলেন সাতটার পরে?"

"হ্যাঁ। প্রায় সাড়ে সাতটায়।"

"এই সাড়ে তিন ঘণ্টা আপনার রুম অরক্ষিত ছিল?"

"তা কেন? আমি তো চাবি দিয়েই..."

"সত্যি বলছেন তো? জৈনধর্মে সত্য বলাকেই কিন্তু শ্রেষ্ঠ গুণ বলা হয়।"

পলকে আহিরচাঁদের মুখ বিবর্ণ। মাথা নামিয়ে নাড়ছেন দু'দিকে।

টুপুর থ। মাসি টের পেল কী করে? আন্দাজে ঢিল? নাকি অন্তর্যামী!

"শুনলাম, চুরির অপরাধে এই ধর্মশালার এক কর্মী গ্রেফতার হয়েছেন," অল্প চড়ল মিতিনের স্বর, "কাজটা কি ন্যায্য হয়েছে? আপনার ধর্মজ্ঞান কী বলে?"

"আমি এমনটা চাইনি," আহিরচাঁদ বিড়বিড় করছেন, "কিন্তু কী যে হচ্ছে!"

মিতিন মৃদুগলায় বলল, "আমরা কি আর-একটু খোলামেলা কথা বলতে পারি আহিরচাঁদজি?"

আহিরচাঁদ নীরব। মিতিন দেখছে আহিরচাঁদকে। মিতিনকে দেখছে টুপুর।

॥ ৮ ॥

নতুন করে শুরু হয়েছে প্রশ্নোত্তর পর্ব, ঠিক জেরা নয়, নরম করেই জিজ্ঞেস করছে মিতিন, থেমে-থেমে জবাব দিচ্ছেন আহিরচাঁদ।

"মন্দির প্রতিষ্ঠাই তা হলে আপনার এত বছর পর কলকাতায় আসার একমাত্র কারণ?"

"বলতে পারেন। তবে আর-একটা উদ্দেশ্যও ছিল। আমাদের বংশের একটা পুরনো নথি অনেককাল ধরেই আমার কাছে পড়েছিল, ভেবেছিলাম সেটাও এই উপলক্ষে আমার ভাইপোদের দিয়ে যাব।"

"কী নথি? গোপন কিছু?"

"ঠিক তা নয়," একটু সময় নিয়ে আহিরচাঁদ বললেন, "আসলে একটা বিক্রিবাটার কাগজ। এক আর্মানি বণিক আমার এক পূর্বপুরুষকে কিছু মূল্যবান জিনিস বেচেছিলেন। সেই পূর্বপুরুষটির হাতে তখন নগদ অর্থ ছিল না, টাকাটা তিনি পরে মেটাবেন এইসব লেখা ছিল আর কী।"

"লেখাটা কি ফারসি ভাষায়? সেই আর্মানি বণিকটির নাম খাজা ওয়াজেদ? আর আপনার পূর্বপুরুষটি সম্ভবত ফতেচাঁদ, অর্থাৎ প্রথম জগৎ শেঠ।"

"আ-আ-আপনি কী করে জানলেন?" আহিরচাঁদের দৃষ্টি বিস্ফারিত।

"আমি তা হলে ভুল বলিনি," মিতিন কায়দা করে জবাবটা এড়িয়ে গেল। পালটা প্রশ্ন জুড়ল, "তা সেই নথি আপনার কাছে গেল কী করে?"

"আমি গৃহত্যাগের সময় ওটি নিয়ে গিয়েছিলাম।"

"কেন?"

"আমার বড়া ভাইসাব, মানে দাদাকে, লোভের হাত থেকে মুক্ত করতে।"

"কীভাবে?"

"আমার বড়া ভাইজির ধারণা ছিল, ওই কাগজে যে জিনিসগুলোর কথা লেখা আছে, সেইসব হিরে, জহরত, বাড়িতেই কোথাও আছে। তাই ওই নথি উনি সারাক্ষণ বুকে আঁকড়ে থাকতেন। মায়ার বাঁধন কাটাতে ওই নথি সরিয়ে ফেলা আবশ্যক ছিল। শুধু তাই নয়, আমার তখন মনে হয়েছিল, ভগবান পার্শ্বনাথজির মূর্তিও আমাদের ঘরে বেমানান। সেই জন্য পার্শ্বনাথজির মূর্তিটিও আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম, "আস্তে-আস্তে ম্লান হয়ে গেল আহিরচাঁদের মুখমণ্ডল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "লাভ হল না কিছুই, শুধুই লোকসান।"

টুপুর চোখ সরু করে সওয়াল-জবাব গিলছিল। ফস করে বলে উঠল, "ওই মূর্তিই কাল চুরি গেল বুঝি?"

"হাঁ বেটি," আহিরচাঁদ ম্রিয়মান, "আমাদের বংশে আর ভাল কিছু হবে না। যে দাদার লোভের মায়া কাটাতে সোনাদানার কাগজ নিয়ে গেলাম, সেও তো শেষ জীবনে পাগল হয়ে গেল। ওই গুপ্তধন খুঁজে না পেয়েই নাকি তাঁর মাথা বিগড়েছিল।"

"তা সেই কাগজ ভাইপোদের দেওয়ার কথা ভাবলেন কেন?"

"ওরা চেয়েছিল।"

"জানত বুঝি কাগজ আপনার কাছে আছে?"

"না। ওরা জানত কাগজ বহুকাল আগেই হারিয়ে গিয়েছে। আলোক, আকাশ দুইভাই আমার আশ্রমে যায় নিয়মিত। আকাশ তো বছরে তিন-চারবার, আলোক অন্তত একবার। কথাচ্ছলে বলেছিলাম ওদের, তখন ওরাই বলল কাগজটা বাড়ির সম্পদ, সুতরাং ওটি কলকাতাতেই থাকা উচিত। আমিও ভেবে দেখলাম, একটা তুচ্ছ কাগজের মায়ায় কেন আটকে থাকি? ভগবান পার্শ্বনাথ দ্রব্যের আসক্তি থেকে মুক্ত হতেই তো উপদেশ দিয়েছেন। ওরা প্লেনের টিকিট পাঠাল, আমিও চলে এলাম।"

"তা কাগজটি এখন কোথায়?"

"আমার কাছেই আছে।"

"একটু দেখতে পারি?"

সামান্য ভেবে বিছানা ছেড়ে নামলেন আহিরচাঁদ। আলমারি থেকে একটা কাপড়ের পুঁটলি বার করলেন। গিঁট খুলে একটা জীর্ণ চামড়ার পুঁথি বাড়িয়ে দিলেন মিতিনকে। সন্তর্পণে পাতা ওলটাচ্ছে মিতিন। শেষ পৃষ্ঠায় এসে থামল। ঝুঁকে কী যেন দেখল চোখ কুঁচকে। ঝোলাব্যাগ থেকে আতসকাচটা বের করে আরও গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করতে-করতে বলল, "একটা নবাবি পাঞ্জা রয়েছে মনে হচ্ছে?"

"উঁহু ওটা শাহি পাঞ্জা। খোদ মুঘল সম্রাট জগৎ শেঠদের যে-কোনও চুক্তি তখন তামাম ভারতবর্ষে মান্যতা পেত।"

"আমি কি পাতাগুলোর ফোটো নিতে পারি?"

অল্প ইতস্তত করে আহিরচাঁদ সায় দেওয়ামাত্র স্ন্যাপ উঠে গেল মিতিনের স্মার্টফোনে। পুঁথিটা ফেরত দিয়ে মিতিন বলল, "ফারসি লিপি কিন্তু আড়াইশো বছর পরেও খুব স্পষ্ট আছে এখনও। বেশ আশ্চর্যজনক,তাই না?"

জবাব ছাড়াই কাপড়ের পুঁটলি ফের চালান হয়ে গেল আলমারির অন্দরে।

মিতিনও খোঁচাল না। আবার ফিরে গিয়েছে পুরনো প্রসঙ্গে।

"আপনার মন্দিরটি তো পৈতৃক বাড়িতেই করবেন?"

"আর হবে কী করে? স্বয়ং পার্শ্বনাথজিই উধাও হয়ে গেলেন।"

"ভাইপোদের বলুন। তারা নতুন মূর্তি গড়িয়ে দেবেন।"

"তা হয় না ম্যাডাম। মন্দির প্রতিষ্ঠা একজন জৈনসন্ন্যাসীর জীবনে সবচেয়ে মহৎ কাজ। এ কাজ জোড়াতালি দিয়ে যেমন-তেমন করে হয় না। ওই মূর্তিটি আমার মন্দিরের জন্য চিহ্নিত করা ছিল, অন্য মূর্তি আমি বসাব কী করে?"

"যদি মূর্তিটা ফেরত পাওয়া যায়?"

"পার্শ্বনাথজি আর ফিরবেন না।"

"তবু যদি মিলে যায়?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সে তখন ভাবা যাবে। প্রকৃত জৈন আকাশকুসুম কল্পনায় বিশ্বাস করে না।"

"কিছু মনে করবেন না, আহিরচাঁদজি, একটা কথা বলব?"

"বলুন।"

"মূর্তিটি যখন এতই মূল্যবান, আপনার কি আর-একটু সতর্ক থাকা উচিত ছিল না?" মিতিনের স্বরে অনুযোগ, "দরজা ঠিকমতো বন্ধ না করে আপনি বেরলেন কী করে?"

"জৈন ধর্মশালা থেকে ভগবান পার্শ্বনাথের বিগ্রহ চুরি হতে পারে, এ যে আমার কল্পনাতেও ছিল না ম্যাডাম," আহিরচাঁদের ঠোঁটে করুণ হাসি। মলিন গলায় বললেন, "আমার তো ঘরে তালা লাগানোর অভ্যেসই নেই। আমাদের রনকপুরের আশ্রমেও তালা চাবি লাগানোর প্রথা নেই কিনা।"

"ও," মিতিন বুঝদারের মতো ঘাড় দোলাল। দুঃখী-দুঃখী গলায় বলল, "আপনার এতদিন পর কলকাতায় ফেরাটা সুখের হল না?"

"তা বটে। ভগবান পার্শ্বনাথের হয়তো ইচ্ছে নয় আমি আবার পুরনো শহরে ফিরে আসি," ছোট্ট শ্বাস পড়ল আহিরচাঁদের। পরক্ষণেই প্রায় স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, "একটাই লাভ, ঘটনাচক্রে আকাশের স্ত্রী, কন্যার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।"

"কেমন লাগল তাদের?"

"ভাল। ভালই তো," আহিরচাঁদের মুখমণ্ডলে হালকা প্রসন্নতার আভা, "আকাশের মেয়েটি তো অতি চমৎকার। এমন সরল বিস্ময় নিয়ে প্রথমদিন আমাকে দেখছিল। আমাদের বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রিটের বাড়িটার নানান গল্প শোনালাম, ও তো আবিষ্ট হয়ে ঘুমিয়েই পড়ল।"

টুপুর টানটান। আহিরচাঁদজিকে শালিনীর স্বপ্নের কথাটা জিজ্ঞেস করে ফেলবে কিনা ভাবছে, আচমকা মিতিন বলে উঠল, "এবার তা হলে চলি আহিরচাঁদজি?"

"কেন?" আহিরচাঁদের স্বরে আলগা ঠাট্টা, "প্রশ্নের ভাঁড়ার কি ফুরিয়ে গেল?"

মিতিন ব্যঙ্গটা গায়েই মাখল না। চিলতে হাসি ফুটিয়ে বলল, "এখনকার মতো এইটুকুই যথেষ্ট।"

"আমার ভগবানজির মূর্তি কি মিলবে? চান্স আছে কোনও?"

"দেখা যাক।"

উঠে দরজা পর্যন্ত গিয়েও আচমকা দাঁড়িয়ে পড়েছে মিতিন। ঘুরে এসে ভারী নরম গলায় বলল, "আপনার কাছে আরও একটা বিষয় জানার ছিল। তদন্তের ব্যাপার নয়... আপনি একজন জ্ঞানী মানুষ বলেই..."

টুপুর তাজ্জব। কী কথা রে বাবা! মিতিনমাসি আমতা-আমতা করছে যে বড়।

আহিরচাঁদ কিন্তু বেশ বিগলিত। ভারিক্কি ভঙ্গিতে বললেন, "আমি মোটেই জ্ঞানী নই। সত্যের সন্ধানে হাঁটছি মাত্র। তবু শোনা যাক, কী জানতে চান?"

"মানুষ তো নানান রকম স্বপ্ন দেখে। সব স্বপ্নের কি অর্থ হয়?"

"অবশ্যই। মানুষ তো এমনি-এমনি স্বপ্ন দেখে না, তাদের স্বপ্ন দেখান জিনেরা। মানে আমাদের ধর্মীয় অবতাররা। যাঁদের আমরা বলি তীর্থঙ্কর। ওঁরা স্বপ্নের মধ্যে দিয়েই তো আমাদের সুপথে চলার রাস্তা চেনান।"

"ভাল-খারাপ সব ধরনের স্বপ্নই তা হলে জিনদের অবদান?"

"না, না তা কেন? খারাপ-খারাপ স্বপ্ন তো আসে মার, মানে অশুভ শক্তি থেকে।"

"বুঝেছি। আমার স্বপ্নটা তা হলে মারই দেখাচ্ছেন। প্রায় রোজ রাতেই।"

"কী স্বপ্ন?"

"বলব? আপনি হয়তো হাসবেন।"

"কখনও না। আপনি নিঃসঙ্কোচে বলুন।"

"দেখছি কী, আমি হঠাৎ ছোট্ট এইটুকুন হয়ে গিয়েছি। ঢুকেছি একটা প্রকাণ্ড ঘরে, একটা দশাসই চেহারার লোকের হাতে..."

দিব্যি গড়গড়িয়ে শালিনীর স্বপ্নটাই হুবহু আওড়ে দিল মিতিন। শুনতে-শুনতে আহিরচাঁদের মুখখানাই বদলে গেল। টকটকে ফরসা গালে সহসা কালচে ছায়া। দু'চোখে ঘোর অবিশ্বাস। ভুরু কুঁচকে বললেন, "আপনি এই স্বপ্ন দেখেছেন?"

"হ্যাঁ, পর-পর পাঁচ রাত। সেই কাল রোববারের আগের রোববার থেকে।"

"অসম্ভব। হতেই পারে না," স্থানকালপাত্র ভুলে চেঁচিয়ে উঠলেন আহিরচাঁদ।

"কেন হতে পারে না আহিরচাঁদজি? এমন স্বপ্ন কি কেউ দেখে না? আপনি এত উত্তেজিতই বা হচ্ছেন কেন?"

মিতিনের নিরীহ জিজ্ঞাসায় আহিরচাঁদ যেন গুটিয়ে গেলেন। কয়েক সেকেন্ড নিশ্চুপ থেকে বললেন, "আপনার অনুমান সঠিক। স্বপ্নটি মারের। অর্থাৎ অশুভ।"

"কোনও বিপদের সঙ্কেত?"

"হওয়া অসম্ভব নয়।"

"তা হলে পাঁচজনকে বলে না বেড়ানোই ভাল, কি বলেন?"

তীব্র চোখে মিতিনকে দেখলেন আহিরচাঁদ। তারপর গুমগুমে গলায় বললেন, "আমি কি এবার ধ্যানে বসতে পারি?"

মিতিন আর কথা বাড়াল না। ছোট্ট করে ঘাড়টি নেড়ে টুপুরকে নিয়ে ঘর ছেড়েছে। একতলায় নেমে টুপুর দেখল ধর্মশালার সামনের ফুটপাথে পায়চারি করছে পার্থমেসো। ওখান থেকেই অধৈর্য স্বরে চেঁচাচ্ছে, "কী এতক্ষণ ভ্যাজরং -ভ্যাজরং করছিলিস? কেস তো আমি সলভ করেই ফেলেছি।"

মিতিন ঠোঁটে তর্জনী ছুঁইয়ে চুপচাপ গাড়িতে ওঠার ইঙ্গিত করল পার্থকে। স্টার্ট দেওয়ার পর বলল, "কাকে-কাকে জেরা করলে?"

"পর-পর পাঁচজনকে। ওই কেয়ারটেকার মনোহর সোলাঙ্কি, কুক কাম ভাঁড়াররক্ষক হরদেও প্রসাদ, রুম সার্ভিসের তিন ওস্তাদ, বালুরাম, গঙ্গাধর, মুরলী। প্রত্যেককে অ্যাভারেজ চার-মিনিট। ব্যস, এতেই সমাধান হাতের মুঠোয়।"

"বটে? তা কীরকম উত্তর বেরোল শুনি?"

"তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না কে এই দুষ্কর্মটি করেছে?" নাটুকে ভঙ্গিতে কাঁধ বেঁকিয়ে টুপুরের দিকে তাকাল পার্থ, "বল তো কে সেই পামর?"

টুপুরের চোখ পিটপিট, "ওই ভালমানুষ'চেহারার কেয়ারটেকার?"

"আজ্ঞে না। উফ্‌ফ, কত কী যে জানলাম। ভাবতে পারিস, বিকেল চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত ধর্মশালায় একজন কর্মচারীও প্রেজেন্ট থাকে না। চোর তাই ওই সময়েই মূর্তিটা হাপিস করেছে।"

"কে সে?"

"এমন কেউ, যে ধর্মশালার এই লুপহোলটা জানে?"

"আরে বাবা সেটা কে বলবে তো?" টুপুর ছটফট করে উঠল, "ধর্মশালার বাইরের কেউ?"

"ধীরে বালিকা, ধীরে," চৌরঙ্গির মোড় টপকে গাড়ির গতি সামান্য বাড়াল পার্থ, "ওই ধর্মশালায় দু'জন অতিথি বিকেলের ওই সময়টাতেই আসত রোজ। আহিরচাঁদের সঙ্গে মোলাকাত করতে। কোনওদিন এ, তো কোনওদিন ও। আবার কোনওদিন দু'জন হাত ধরাধরি করে।"

"তারা কারা?" বলেই টুপুরের মগজ ঝিলিক, "আহিরচাঁদজির দুই ভাইপো?"

"যাক মাসির চামচাগিরি করে একটু উন্নতি হয়েছে। গোবরের জায়গায় ঘিলুর পরিমাণ বাড়ছে," মেসোর ব্যঙ্গটা প্রশস্তি হিসেবে গায়ে মেখে নিল টুপুর। কিন্তু মনে সন্দেহের খচখচ। জিজ্ঞেস করেই ফেলল, "কিন্তু ওঁরা নেবেন কেন? কাকা অতদূর থেকে মূর্তিটা এনেছেন মন্দির গড়ে সেখানে পার্শ্বনাথজিকে স্থাপন করবেন বলে।"

"অ। এইসব ব্যাপার আছে নাকি?" পার্থ ঈষৎ থমকাল। পরক্ষণেই বলল, "মন্দির মানেই তো পাবলিক প্রপার্টি। ভাইপোরা হয়তো মূর্তিখানা নিজেদের দখলে রাখতে বেশি আগ্রহী ছিল। তাই

বিকেলের অরক্ষিত সময়ে এসে মাল ঝাপ্পুস করে নিতেই পারে।"

"দু'জনে মিলে? একজোট হয়ে?"

"সেটা বলা শক্ত। ওদের যে-কোনও একজন হয়তো..."

"এক সেকেন্ড," বহুক্ষণ পর মিতিন সরব, "মূর্তিটা দেখতে কেমন, সাইজে কত বড়, সে বিষয়ে কে কী বলল?"

"ওরা কেউ দেখেছে নাকি? ওদের কথা শুনে তো তেমনটা মনে হল না।"

"তুমি জিজ্ঞেসও করোনি?"

"ধুস। ওটা কোনও প্রশ্ন নাকি? জেনে লাভ কী হত?"

"মূর্তিটা উনি রেখেছিলেন কোথায়?"

"নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারল না। কেউ বলে আহিরচাঁদজির ঝোলায়, কেউ বলে রুমে একটা নাকি কাঠের আলমারি আছে, হয়তো তার মধ্যেই রাখা ছিল।"

গাড়ি ভবানীপুর ঢুকেছে, ভিড় থিকথিক পথ দেখতে-দেখতে পার্থ আপন মনেই বলল, "যেখানেই থাকুক, আলোক, আকাশের তো অজানা নয়। সুতরাং সন্দেহের তিরটা ওদের দিকেই যায়। তা ছাড়া ভেবে দেখো, এত ভ্যালুয়েবল একটা জিনিস গায়েব হয়েছে, টিভি খবরের কাগজ সর্বত্র বেরিয়েছে খবরটা, অথচ দুই মূর্তিমানের টিকি নেই। এটাও নিশ্চয়ই একেবারে নিরামিষ ঘটনা নয়।"

"হুম। তা দুই ভাইয়ের কোনও একজনও যে কাল বিকেলে ধর্মশালায় এসেছিল, এমন কোনও তথ্য প্রমাণ মিলেছে কি?"

"আরে, ওইটুকুর জন্যেই তো আটকে আছে। নয়তো আমিই অনিশ্চয়বাবুকে জানিয়ে দিতাম। কেস ক্লোজড, আসামীদুটোকে গারদে পুরে দিন। বাই দা বাই, অনিশ্চয়বাবুর পুলিশ তাড়াহুড়ো করে মিছিমিছি যে লোকটাকে ফাটকে ঢোকাল, আশা করি তাকে অন্তত..."

"ওটা একটা গল্প," মিতিন মিচকে হাসল, "আমিই ডি সি ডি ডি সাহেবকে ছড়াতে বলেছি গল্পটা, যাতে সাংবাদিকরা না জ্বালাতে পারে।"

"কী ডেঞ্জারাস গেম। জানতে পারলে তো মিডিয়া পুলিশকে তুলোধনা করবে।"

"প্রথমত, জানতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, জানতে পারলে পুলিশ বলবে আসল চোরকে ধরার জন্য ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছে।"

এরকম কৌশল মাসি হরবখত করে, মাসির মগজের উপর অগাধ আস্থার দরুন অনিশ্চয়আঙ্কলও নিশ্চিন্তে অংশ নেয় খেলাটায়, জানে টুপুর। তবু আজ একটু অবাকই হল। মাসিও কি তবে নিশ্চিত, মূর্তিটা শালিনীর বাবা-জ্যাঠারাই নিয়েছেন? কিন্তু মাসি একবারও আহিরচাঁদজিকে ওই লাইনে প্রশ্ন করল না। হঠাৎ নিজের নাম করে শালিনীর স্বপ্নটা শোনানোর বা কী অর্থ? শুধুই সন্ন্যাসীটিকে চমকে দেওয়া? নাকি অন্য কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য আছে মাসির? বিদঘুটে স্বপ্নটার কোনও মানে খুঁজে পেল কি? আহিরচাঁদজির ঘরে অতটা সময় কাটানো কি শেষপর্যন্ত মাসির কোনও কাজে লাগবে? ভদ্রলোক থুড়ি, সন্ন্যাসীটিকে যেন বড্ড বেশি পরখ করছিল মাসি। কেন?

"অ্যাই টুপুর, ঢুলছিস নাকি?"

মাসির ডাকে টুপুরের ভাবনাটা ছিঁড়ে গেল। তাড়াতাড়ি টুপুর বলল, "কই না তো? আমি ভাবা প্র্যাকটিস করছি।"

"গুড... তা কাল থেকে তো তোর স্কুল?"

বেজার গলায় টুপুর বলল, "হুঁ।"

"ওবেলা তো তা হলে তোকে হাতিবাগানে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।"

"আরে আমি তো আছিই," পার্থ তূরন্ত সবাক, "অ্যালেন্স কিচেনের কাটলেট অনেকদিন চাখা হয়নি, আজ নয় সেটাও..."

সুখাদ্যের চিন্তায় গাড়ি চালাতে-চালাতেও পার্থর চোখ জ্বলজ্বল। পিছন থেকে আচমকা মিতিনের ঘোষণা, "উঁহু, আজ আমি যাব। শুধু আমি আর টুপুর।"

মাসির বলার ভঙ্গিটা যেন অচেনা-অচেনা। স্বরে যেন আমিষ-আমিষ গন্ধ।

॥ ৯ ॥

সন্ধের কলকাতা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে হালকা জ্যাম। গাড়িতে মিতিনের পাশে টুপুর শুকনো মুখে বসে। দু'-দুটো দিন বেশ রোমাঞ্চের স্বাদ মিলেছিল, আজ বাড়ি ফিরে আবার শুরু হবে পুরনো রুটিন। সেই অ্যালজেব্রা, সেই জ্যামিতি, সেই ইতিহাস, ভূগোলের নীরস জগৎ। উফ, ভাবলেই কান্না পায়।

মানিকতলার মোড় পেরিয়ে খানিকদূর গিয়েই গাড়ি ডাইনে ঘোরাল মিতিন। একটা আঘোচনো রাস্তায় ঢুকছে।

টুপুর একটু অবাক হয়েই বলল, "কী গো, আগে অন্য কোথাও যাবে নাকি?"

মিতিনের সংক্ষিপ্ত জবাব, "হুঁ।"

"তোমার কোনও কাজের ব্যাপারে?"

"শুধু আমার নয়, তোরও কাজ।"

"মানে?"

"আমরা বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রিটে যাচ্ছি। আলোকচাঁদ শেঠের বাড়ি।"

হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল টুপুরের। কোনওক্রমে উত্তেজনা দমন করে বলল, "কেন গো মাসি? মূর্তিটা কি তবে উনিই..."

"যদি সত্যিই চুরিটা হয়ে থাকে, তবে ওঁরই কালপ্রিট হওয়ার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। আমার মেথড অফ এলিমিনেশন তো তাই বলছে?"

"যদি ঘটে থাকে মানে? চুরিটা কি হয়নি?"

"দেখা যাক। সময়ই বলবে।"

কী হেঁয়ালি মার্কা উত্তর। পরের প্রশ্নটা করে উঠতে পারল না টুপুর, তার আগেই আবার বাঁক নিয়েছে গাড়ি। এবার ঢুকছে একটা সরু রাস্তায়। ও মা, সামনেই তো পরেশনাথের মন্দির। ওই তো মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। এটাই তবে বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রিট!

গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে একঝলক মন্দিরটা দেখল টুপুর। তাদের বাড়ি থেকে মোটেই তেমন দূর নয়, তবু সেই ছেলেবেলার পর আর আসা হয়নি। পাশাপাশি আরও তিনটে জৈন মন্দির। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুণে বেশ একটা পবিত্রতার ভাব আছে প্রতিটি মন্দিরে। কিন্তু ছেলেবেলার সেই মুগ্ধতা যেন আর জাগছে না।

মিতিন মন্দিরের পাশের রাস্তা ধরে এগোচ্ছে গাড়ি নিয়ে। মন্দির পেরতেই চওড়া হয়েছে রাস্তা। আবার ক্রমশ সরু। সেই পথের ধার ঘেঁষে একটা মরচে ধরা লোহার ফটকের সামনে পার্ক করল গাড়ি। স্টিয়ারিং লক করে ডাকল টুপুরকে, "নেমে পড়।"

লোহার গেটের ওপারে এক দর্শনীয় বাড়ি। বাহারি দেখনদারির জন্য নয়, স্রেফ প্রাচীনত্বর কারণেই চোখ আটকে যায়। ইস, কী চেহারা। একসময়ের গোল-গোল ডোরিক থামগুলো থেকে ইটের দাঁত বেরিয়ে আছে, রঙের বালাই নেই, প্লাস্টার খসে গিয়ে খোবলা-খোবলা হয়ে গিয়েছে, গা-ময় ঝুলের আস্তরণ জালের মতো ঢেকে ফেলেছে জীর্ণ গৃহের সর্বাঙ্গ। শহরে এমন বাড়ি টিকে আছে এখনও।

টুপুর সংশয়ের সুরে বলল, "এ বাড়িতে মানুষ থাকে নাকি?"

"হ্যাঁ রে বাবা, আছে লোক। ওই দ্যাখ, উপর দিয়ে আলো।"

তাই তো ঘুলঘুলি দিয়ে ক্ষীণ একটা দীপ্তি যেন আসছে বটে। কিন্তু এই বাড়িতে জগৎ শেঠের বংশধর বাস করছে এমনটা কল্পনা করা বেশ কঠিন।

মিতিন নিচু গলায় বলল, "ঘাবড়ে গেলি নাকি? সাবধানে পা ফেলে আয়। আমার পিছন-পিছন।" বলেই লোহার গেট ঠেলল মিতিন। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে খুলে যেতেই পলকা বিস্ময়। একটা চকচকে বিদেশি গাড়ি দাঁড়িয়ে। আলোকচাঁদের?

চওড়া ভাঙাচোরা পাঁচধাপ সিঁড়ি মাড়িয়ে একটা বারান্দায় উঠল দু'জনে। সামনে আটফুটি দরজা, পাল্লার মাথায় সার বসানো রঙিন কাচের অর্ধবৃত্ত। জলুস নেই কাচের, কিন্তু আভিজাত্যের গরিমা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিকরোচ্ছে যেন।

দরজার ফ্রেমে কলিংবেল। টিপল মিতিন। কোনও সাড়াশব্দ নেই। অনন্ত প্রতীক্ষার পর আবার আঙুল রেখেছে সুইচে, খুলে গিয়েছে পাল্লা। এক মাঝবয়সি ফরসা লম্বা টাকমাথা সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে। রীতিমতো কর্কশ ভঙ্গিতে প্রশ্ন জুড়লেন, "কী চাই?"

টুপুরকে অবাক করে দিয়ে মিতিনও পালটা তেরিয়া গলায় বলল, "আপনিই শেয়ার ব্যবসায়ী আলোকচাঁদ শেঠ?"

"হ্যাঁ। তো?"

"কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আসছি। একটা চুরির তদন্তে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করব।"

আলোকচাঁদ পলকের জন্য থতমত। পরক্ষণে প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন, "কী চুরি? কার চুরি? আমি কোনও চুরিটুরির খবর রাখি না।"

"বাজে কথা থামান। আপনার কাকার কোটি টাকার মূর্তি চুরি হয়ে গেল, আপনি তা জানেন না?" মিতিনের স্বর আরও কঠোর হল, "আপনি কি চান লালবাজারে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে আপনাকে জেরা করি? ওখানে কিন্তু বয়সটয়স মানে না, যাকে তাকে থার্ড ডিগ্রি দেয়।"

আলোকচাঁদ মিনিটখানেক রা কাড়লেন না। নিশ্বাস ফেলছেন জোরে-জোরে। তারপর আচমকাই স্বরে মধু, "আসুন, ঘরে বসে কথা বলি।"

অন্দরটা বাইরের মতো হতশ্রী নয়। ঢুকেই অনেকটা খোলা জায়গা, হিন্দি সিরিয়ালের সেটের মতো। বেশ কয়েকটা ভারী সোফা শোভা পাচ্ছে সেখানে। তবে চেহারায় আদ্যিকালের ছাপ। একটা পেল্লাই সাইজের দেওয়াল ঘড়িও দৃশ্যমান। টিউবলাইটের আলোয় বুঝতে অসুবিধে নেই ঘড়ির পেন্ডুলামটি অচল। বৈঠকখানার সাজসজ্জার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘড়ির সময়ও থেমে আছে বহুকাল। উঁচু কড়িবরগার সিলিং যেন সাক্ষী দিচ্ছে দূর অতীতের।

টুপুরের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছেন আলোকচাঁদ। মিতিন গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, "ও আমার বোনঝি। ভবিষ্যতে পুলিশে জয়েন করতে চায়। ওকে সঙ্গে রাখি।"

"তা বেশ তো।" চটপট একটা কাঠ-কাঠ হাসি ফোটালেন আলোকচাঁদ। বিনয়ী স্বরে বললেন, "কী জানতে চান আমার কাছে?"

"বেশি ধানাইপানাই করবেন না," মিতিন তেজের সঙ্গে বলল, "সাফ-সাফ বলুন দেখি, আহিরচাঁদের মূর্তিটি গেল কোথায়?"

"সে তো চুরির জন্য কে যেন অ্যারেস্ট হয়েছে শুনলাম।"

"তাকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে। কারণ সে মূর্তি নেয়নি। খবর আছে, বিকেলে একজন মাত্র লোক আহিরচাঁদজির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। উনি তখন ছিলেন না, ওঁর ঘরে অনেকক্ষণ একা বসেছিল লোকটা। সে যখন বেরিয়ে যায়, দরজা বাইরে থেকে টেনে দিয়েছিল, তাই দরজার কড়ায় তার আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। সে যদি দরজা হাট করে রেখে দিত, তা হলে হয়তো তাকে ধরাই যেত না। কেন যে সে এমন একটা সিলি মিসটেক করল..."

"বাহ, এখন তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট মেলালেই আসামী ধরা পড়ে যাবে।"

আলোকচাঁদের নির্বিকার মন্তব্যে মিতিন যেন ঈষৎ অপ্রতিভ। মাসি যে কায়দা করে চালটা দিয়েছিল, এতেই সাধারণ অপরাধীর ফেঁসে যাওয়ার কথা। কিন্তু এই আলোকচাঁদ তো দিব্যি কেটে বেরিয়ে গেলেন! নাকি ইনি সত্যিই নিরপরাধ?

মিতিন সহসা সুর বদলেছে, মুখে একটা হাসি টেনে বলল, "সে তো আমরা জানিই। তবু আপনাকে সন্দেহের তালিকায় বাইরে আনতে গেলে একটুখানি বিরক্ত তো আপনাকে করতেই হবে। যদি আপনি সহযোগিতা করেন..."

"কীভাবে?"

"আপনার বাড়িটা একবার তল্লাশি করতে চাই।"

"আপনার ওয়ারেন্ট আছে নিশ্চয়ই?"

"আজ্ঞে না। সার্চটা আমি আন-অফিসিয়াল রাখতে চাই," মিতিন আচমকা গলা খাদে নামাল। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বলল, "আহিরচাঁদজির সঙ্গে আমার বাতচিত হয়েছে। উনি বলেছেন, মূর্তি ফেরত পেলে উনি চুরির কেসটা তুলে নেবেন।"

হঠাৎ মাসি-বোনঝিকে চমকে দিয়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন আলোকচাঁদ। তর্জনী উঁচিয়ে বললেন, "কাকা ভেবেছেনটা কী, অ্যাঁ? আমাকে উনি চোর প্রমাণ করতে চান? আসল চোর তো কাকা নিজে।"

"মানে? একজন সাধুসন্ত মানুষের নামে এ কী অপবাদ।"

"হুঁ, সাধু। ওই মূর্তিটা কি ওঁর? আমাদের পরিবারের জিনিসটি তো চুরি করেই নিয়ে গিয়েছিলেন? সেই মূর্তি যদি আমি নিয়েও আসি, সেটাকে কি চুরি বলে?"

"আহিরচাঁদজি তো সেই মূর্তিটা ফেরত দিতেই সেই রনকপুর থেকে..."

"তাই তো জানতাম। এখন তো দেখছি ওঁর মতলব অন্য। উনি এসেছেন নিজের ধান্ধায়।"

অনুভূতিশীল পাঠকদের জন্য

নীহাররঞ্জন মুখোপাধ্যায় কৃত
• স্মৃতি স্বপ্ন সাহিত্য ৭০

ডঃ ভূতনাথ চৌধুরী কৃত
• সন্টলেকের ভূত ৫০

মঞ্জরদের জীবন ও কাজের সীমারেখা ১৫০

ডব রায় কৃত
• বাংলার লোকবৃত্ত ও লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা (২য় স.) ১০০
• একুশ শতকের ভারত : সমাজ ও অর্থনীতি ৮০
• আধুনিক ভারত : নতুন অর্থনীতি ও বিবিধ প্রসঙ্গ ১০০
• ঋত্বিপদী কুসুমপুর ৬০

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত
• থিয়েটার ঘরে বাইরে ১০০

ডঃ রবীন্দ্রনাথ পান কৃত
• চার্লস ডারউইন ৬০

• প্রোগ্রামে রোগ আরোগ্য ও জীবনশৈলী ১৫০

• সেরা প্রেমের গল্প ৭০

কালিদাস ভদ্র সম্পাদিত
• সেরা প্রেমের গল্প ২৫০
• অন্তহীন বিবেকানন্দ ২৫০

"কী বলছেন? উনি কলকাতায় একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন..."

"বিলকুল বকোয়াস। তেমন ইচ্ছে থাকলে রনকপুর থেকে আসার আগেই তো জানাতেন। কলকাতায় পা রাখার পরের দিন হঠাৎ মন্দির বানানোর বাসনা জেগে উঠল।" আলোকচাঁদ মাথা ঝাঁকাচ্ছেন, "নেহি জি, জরুর ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।"

"কী হতে পারে?"

"ও আমি জানি না। লেকিন আমি ভি মারোয়াড়ি। শেঠ মানিকচাঁদ, ফতেচাঁদের বানিয়া রক্ত আমার শরীরেও তো থোড়াবহুত আছে। তিরিশ বছর ধরে শেয়ার মার্কেটের ওঠানামাও দেখছি। সুতরাং নাফালোকসানের আমি গন্ধ পাই ম্যাডাম। সন্ন্যাসী হোক যাই হোক, বড় কোনও দাঁওয়ের বেপার না থাকলে চাচাজি শহরে রয়ে যেত না।"

"বাড়ির অংশ বাগানোই কি সেই দাঁও?"

"না-না, তার চেয়েও বড়া কিছু আছে।"

"কী সেটা? আপনার ভাই আকাশচাঁদজি কি জানেন কিছু?"

আলোকচাঁদ চোখ সরু করে খানেক দেখলেন মিতিনকে। তারপর গরগরে গলায় বললেন, "আকাশ তো চাচাজির দলে আছে। উনার পার্টনার বনেছে।"

"এমন ধারণা হল কেন?"

"মূর্তি কলকাতায় আমার কাছে জিম্মা করে দিয়ে চাচাজির চলে যাওয়ার কথা। সেই মূর্তি তো দিচ্ছেনই না, উলটে বাড়ির অংশ না দিলে মামলা করার ভয় দেখাচ্ছেন চাচাজি। কাল আকাশের সঙ্গে ওই নিয়ে ডিসকাস করতে গেলাম, ও আমায় উলটোসিধা বলে ভাগিয়ে দিল," আলোকচাঁদের মুখে বাঁকা হাসি, "এবার দ্যাখ, তোর চাচাজি তোকে কী দেয়।"

"শুনেছি আপনার চাচাজির কাছে নাকি কী সব নথি আছে?" মিতিন হাওয়ায় কথাটা ভাসিয়ে দিল, "বোধ হয় গুপ্তধন বা ওই ধরনের কিছু?"

আলোকচাঁদের চোখের মণিজোড়া দপ করে জ্বলে উঠল। পরক্ষণেই আবার স্বাভাবিক। ধূর্ত হেসে বললেন, "আছে তো আছে। এ বাড়িতেই আছে। থাকবে। এ বাড়ির ভাগ তো আমি কাউকে দিব না। মরার আগে গভর্নমেন্টকে বাড়ি দিয়ে যাব, সেও ঠিক আছে, লেকিন ওই চাচা-ভাতিজার কপালে কিছু মিলবে না।"

"বুঝলাম," মিতিন ঠোঁট চাপল, "তা যে কাজের জন্য আসা, সেটা হয়ে যাক।"

"কী বলুন তো?"

"আপনারা তিনজনে যতখুশি লড়াই করুন। কিন্তু পুলিশকে তার কাজটা করতে দিন," মিতিন অল্প হাসল, "মূর্তিটা এবার ফেরত দিন।"

আলোকচাঁদ আকাশ থেকে পড়লেন, "মূর্তি তো আমার কাছে নেই।"

"আপনি কিন্তু একটু আগেই স্বীকার করেছেন..."

"উঁহু, আমি বলছি, মূর্তিটা যদি এনেও থাকি, কাজটা অন্যায় নয়," আলোকচাঁদ নির্বিকার, "তার অর্থ কিন্তু এই নয়, পার্শ্বনাথজির মূর্তি আমি সরিয়েছি।"

"তা হলে তো এ বাড়িটা একটু খুঁজেপেতে দেখতে হয়। যদি সার্চ ওয়ারেন্টের কথা বলেন তো আনিয়ে নিতে পারি। তাতে কি আপনার সম্মান বাড়বে?"

আলোকচাঁদ কী যেন ভাবলেন একটু, তারপর উঠে দাঁড়ালেন। সহজ গলায় বললেন, "বেশ, দেখুন আমার ঘরটর। সন্দেহটা মিটিয়েই যান।"

পাঞ্জাবির নীচে কোমরে বাঁধা বটুয়া থেকে মস্ত একটা চাবির গোছা বের করলেন আলোকচাঁদ। বসার জায়গার লাগোয়া একখানা দরজা খুলে দিয়ে বললেন, "এটাই ছিল আমাদের বৈঠকখানা। এখান থেকেই শুরু হোক।"

ঘরটা মোটামুটি বড়ই। আগেকার দিনের আসবাবে ঠাসা। নানান কিসিমের পুতুলে সাজানো কাচবসানো কাঠের শোকেস, চিত্রবিচিত্র রং করা সিলিং, শ্বেতপাথরের টেবিল, প্রকাণ্ড ডিভান, সর্বত্র অতীতের ছোঁয়া। দেওয়ালে পর-পর পূর্বপুরুষদের অয়েল পেন্টিং, বাঁধানো ফোটোও আছে কয়েকটা। পুরনো হলেও এ ঘরের কোনওকিছুই তেমন মলিন নয়। দেখেই মালুম হয়, নিয়মিত হাত পড়ে এই কক্ষে।

একটামাত্র টিউবলাইটের ম্যাড়মেড়ে আলোয় চতুর্দিক নিরীক্ষণ করতে-করতে মিতিন বলল, "আপনার কাজের লোকজন কোথায়?"

"সারাদিনের জন্য কেউ থাকে না," আলোকচাঁদের তুরন্ত জবাব, "পিতাজির আমলের একজন আছে, সকাল ছ'টায় আসে, সন্ধের মুখে-মুখে চলে যায়।"

"দু'বেলার রান্নাবান্নাও কি তিনিই করেন?"

"আমি একাহারী। সূর্যাস্তের পর জলও স্পর্শ করি না।"

"আপনি তো খুব সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ।"

"ধর্মের অনুশাসন মেনে চলি। একজন সত্যিকারের জৈনের মতো," আলোকচাঁদ ঈষৎ উষ্মার সঙ্গে বললেন, "সেই জন্যেই তো বলছি, চাচাজি কেন, মন্দির কি আমিই বানাতে পারি না? মূর্তি আমাকে দিয়ে যেতে ওঁর কী অসুবিধে ছিল? যত্তসব অন্যের কাঁধে চেপে নাম কেনার ফিকির!"

"হুম!" মিতিন অল্প ঘাড় নাড়ল। ঘরময় ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ থামল। একটা বাঁধানো ফোটো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ইনি কেন?"

"আমার পিতাজি," আলোকচাঁদ দু'হাত জোড় করে নমস্কার করলেন, "স্বর্গীয় শ্রী দীপচাঁদ শেঠ।"

মিতিন ডাকল, "অ্যাই টুপুর, দ্যাখ তো এঁকে চিনতে পারিস নাকি?"

টুপুর সরু চোখে দেখল ফোটোটা। পাগড়ি মাথায় এক সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোক। মুখখানা বেশ ফোলা-ফোলা, মোটা পাকানো গোঁফ, চৌকো ফ্রেমের চশমাপরা বড়-বড় চোখ...টুপুর কি কখনও দেখেছে?

টুপুর দু'দিকে ঘাড় নাড়ল, "উহুঁ, মনে পড়ছে না তো।"

"ভাল করে লক্ষ কর।"

খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল টুপুর। চোখজোড়া যেন পরিচিত মনে হচ্ছে। আকাশচাঁদের সঙ্গে হালকা মিল আছে কি? নাকি অন্য কারও কথা বলছে মাসি? টুপুর হাল ছেড়ে দিল। মিতিন টুকুস করে স্মার্টফোনে একটা ফোটো তুলে নিল ছবিটার।

অমনি আলোকচাঁদ প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, "এসব কী হচ্ছে?"

মিতিনের জবাব, হামেহাল হাজির, "আমার বোনঝিকে ওদের স্কুল থেকে জৈনদের উপর একটা প্রোজেক্ট করতে বলেছে। ওতে আপনার বাবার ফোটোটা দিয়ে দেব ভাবছি। অভিজাত জৈন হিসেবে ওঁর চেহারাটা বেশ মানাবে।"

"উনি তো অভিজাতই ছিলেন।"

"শেষ বয়সে মাথাটায় একটু গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, এই যা..."

"কে বললেন? চাচাজি? উনি চলে যাওয়ার দুঃখেই কিন্তু পিতাজি..."

পুরনো কাহিনি বলছেন আলোকচাঁদ, কিন্তু মিতিন যেন শুনছেই না। খোঁজাখুঁজিতেও মন নেই, একের পর-এক তৈলচিত্র দেখে চলেছে। ছবির একদম কাছে চোখ নিয়ে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে কী যেন। চিত্রকরের নাম খুঁজছে? হবেও বা। দেওয়ালের মধ্যিখানে প্রথম জগৎ শেঠ ফতেচাঁদের ছবিটি বিশাল। রক্তবর্ণ পাথরবসানো পাগড়িধারী ব্যবসায়ীর প্রতিকৃতির সামনে পা আটকে গিয়েছে মিতিনের।

"সন্ধান মিলল?"

আলোকচাঁদের বিদ্রুপ মেশানো প্রশ্নের জবাবে মিতিনের মুখে কুলুপ।

আলোকচাঁদ ফের বললেন, "এবার আমাদের রান্নাঘর, ভাঁড়ার দাসদাসীদের রুমগুলোয় চলুন। বহুকাল অবশ্য ব্যবহার হয় না। তারপর দোতলা। আলমারি-বিছানা-তোষক-বালিশ খুলে ছিঁড়ে দেখুন কুছ মেলে কিনা।"

মিতিন একটুও চটল না। বরফশীতল স্বরে বলল, "থাক, আর

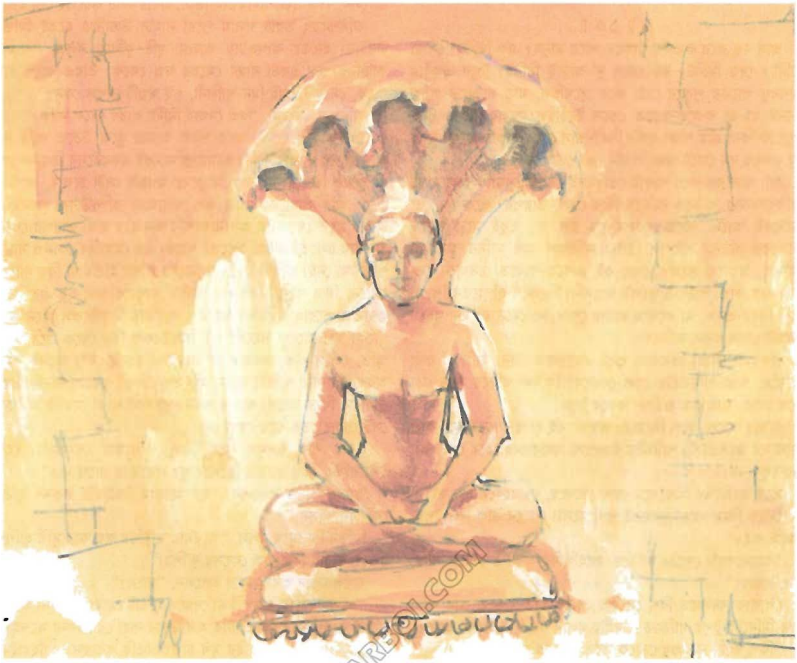

দরকার নেই।"

"সে কী? কেন? জোশ খতম?"

"বলতে পারেন। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।"

আলোকচাঁদকে চমকে দিয়ে ঘর চেড়ে বেরিয়ে এল মিতিন। টুপুরকে নিয়ে নতমস্তকে বিদায় জানাল আলোকচাঁদকে।

বাইরে এসেও মিতিন ম্রিয়মাণ। স্টার্ট দিল গাড়িতে, চলছে ধীরে। পরেশনাথের বড় মন্দিরটার গেটে দাঁড়াল। টুপুরকে বলল, "চল, ভিতরটায় গিয়ে বসি একটু?"

টুপুর মাসির চকিত ভাবান্তরে অবাক, "কেন গো? মিশন ফেল করল?"

"পুরোটা নয়। শুধু একটা পয়েন্ট মিলছে না। মহিমাপুরে যেতে হবে।"

"মহিমাপুরে কেন?"

"ওখানেই জগৎ শেঠদের আদি বাড়ি। স্বপ্নের তালা খোলার চাবি হয়তো ওখানেই মিলবে।"

"বুঝলাম না। কী হেঁয়ালি করছ?"

"চল, বুঝিয়ে বলছি।"

অন্দরের প্রশস্ত চাতালটা প্রায় ফাঁকা। অদূরে মন্দিরের সিঁড়ি। উপরে মূল মন্দিরে ঝলমল করছে আলো। সেদিকে তাকিয়ে মিতিন বলল, "সুন্দর না মন্দিরটা?"

"সো-সো। আমার খুব একটা পছন্দ হচ্ছে না?"

"কেন রে? ছেলেবেলায় তো পরেশনাথ মন্দিরের নাম শুনলেই লাফাতিস।"

"ছেলেবেলায় কী বিশাল মনে হত। মন্দিরের চুড়োটা কত উঁচু দেখাত তখন। এখন মোটেই সেরকম লাগছে না," টুপুর বিজ্ঞের সুরে বলল, "ছেলেবেলায় দেখা অনেক প্রকাণ্ড জিনিসই বড় হলে আর তত বড় লাগে না। ফলে সেই চার্মটা আর আসে না।"

হঠাৎ মিতিনের চোখদুটো বড়-বড় হয়ে গেল। টুপুরকে স্তম্ভিত করে দিয়ে ঠাসঠাস চড় মারছে নিজের গালে। বিড়বিড় করছে, "ছিঃ, এই সামান্য জিনিসটা খেয়াল হয়নি?"

টুপুর অস্ফুটে বলল, "কী খেয়াল হয়নি গো মাসি?"

আচমকা টুপুরকে জড়িয়ে ধরেছে মিতিন। চকাস করে গালে চুমু খেল। টুপুরের নাকখানা নেড়ে দিয়ে বলল, "ওরে, তুইই তো আমায় মোক্ষম সমাধানটা দিলি।"

টুপুর হতবুদ্ধির মতো বলল, "মানে?"

"মানে বুঝে আজ কাজ নেই," শচীন দেববর্মনের সুরে গেয়ে উঠল মিতিন। হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে দিল টুপুরকে, "এখন বাড়ি চল। বাকিটা কাল হবে।"

"কাল কী হবে?"

"যবনিকা উত্তোলন।"

"কীসের?"

"উহুঁ, এখন কোনও প্রশ্ন নয়। চটপট গাড়িতে ওঠ। এক্ষুনি ফিরতে হবে। রাতভর কত কাজ, কত কাটাকুটি প্লাস-মাইনাস...আর হ্যাঁ, কাল স্কুল থেকে ফিরে...হা হা হা...মাদারির খেল দেখবি...ঝিকিসব্যাক... চিচিংফাঁক...

কী আবোলতাবোল বকছে মাসি? পাগল হয়ে গেল নাকি? অথবা

টুপুরই যা দেখলে-শুনছে, তা সত্যি নয়। স্বপ্ন।

॥ ১০ ॥

শ্বাস বন্ধ করে কতক্ষণ থাকতে পারে মানুষ? এক মিনিট? সোয়া মিনিট? দেড় মিনিট? বড় জোর দু'-আড়াই মিনিট? টুপুর একবার দেশবন্ধু পার্কের পুকুরে চেষ্টা করে দেখেছিল, মাত্র সাতাত্তর পর্যন্ত গুনেই হা হা করতে-করতে ভেসে উঠেছিল জলের উপর। সেই টুপুরকে কিনা প্রায় পাক্কা একটা দিন নিশ্বাস চেপে থাকতে হচ্ছে। টুপুর যে এখনও দম ফেটে অক্কা পায়নি, এই তো ঢের।

হ্যাঁ, শ্বাস বন্ধ করে থাকাই তো। সেই যে মিতিনমাসি কাল রাতে হাতিবাগানের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেল, তারপর থেকে দম তো আটকেই আছে। রাতে একদম ঘুম হল না, শুধুই মনে পড়ছে কালকের বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রিটের অভিযান আর মাসির অসংলগ্ন আচরণ। সকালে স্কুলেও গেল ওই ভাবতে-ভাবতে। সেখানে তো আর-এক কাণ্ড, শালিনী স্কুলেই আসেনি। বিকেলে হাঁপাতে-হাঁপাতে বাড়ি ফিরে শুনল, না এসেছে মাসির ফোন, না মেসোর। মান খুইয়ে নিজেই ফোন করল মাসিকে।

একবার। দুবার। তিনবার। শুধুই এনগেজড টোন। মাসি না কথা দিয়েছে, আজ ভানুমতীর খেল দেখাবে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে তো হতে চলল, আর কত প্রতীক্ষা করবে টুপুর।

রাস্তার আলো জ্বলে গিয়েছে। অগত্যা বই খুলে বসতেই হয়। কাল ম্যাথসের ক্লাস টেস্ট, শালিনীর স্বপ্নরহস্য সমাধানের চেয়ে সেটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সবে জ্যামিতির থিওরেমে চোখ রেখেছে, ডোরবেলে ডিং ডং।

দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলতেই পার্থমেসো। পিছনে উঁকি দিল টুপুর, "মাসি কই?"

"আলোকচাঁদ শেঠের বাড়িতে। সহেলিদির অনুমতি করিয়ে নিচ্ছি, চটপট আয়।"

পোশাক বদলাতে বিশ সেকেন্ড, মাকে হাত নাড়তে আর পাঁচ। আধ মিনিটেই টুপুর গাড়িতে। উদগ্রীব গলায় বলল, "কী হল আজ?"

"কিচ্ছু জানি না। শুধু তোকে তুলে আনতে বলল।"

"কে আছে ওখানে? শুধু মিতিনমাসি?"

"কিছুই জানি নারে। তুইও যে তিমিরে, আমিও সেই তিমিরে।"

বুকে ঠাঁই ঠকাঠক তেহাই নিয়েই ফের বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রিট। ফাঁকা-ফাঁকা রাস্তাটা আজ যেন আরও বেশি নির্জন। সামনে পথবাতিটা জ্বলছে না, আধো আলোছায়ায় আলোকচাঁদের বাড়ি আজ আরও রহস্যময়।

দরজা খোলাই ছিল। ঢুকে থমকে গেল টুপুর। আলোকচাঁদের বসার জায়গা তো প্রায় ভর্তি। দুই ভাই, সন্ন্যাসী কাকা, এমনকী, স্বয়ং অনিশ্চয়আঙ্কলও ডিভানে আসীন। সবচেয়ে বড় চমক, শালিনী। বাবার পাশে গুটিসুটি মেরে বসে।

ধন্দ লাগল টুপুরের। শালিনীর বাবা-জ্যাঠা-দাদু কাউকে না-কাউকে আজ অপদস্থ করবে মাসি, এখানে শালিনীকে না রাখাটাই তো ঠিক ছিল। যাকগে, মাসি যা ভাল বুঝছে, তাই করছে নিশ্চয়ই। মিতিনের একহাতে স্মার্টফোন, অন্য হাতে একটা কাগজ। টুপুরকে আঙুল নেড়ে ডাকল। কাছে যেতেই নিচু গলায় বলল, "শালিনী হংসোমধ্যে বকো যথা হয়ে আছে, তুই আর ও একসঙ্গে বোস। তার আগে এই ফোটোগুলো দ্যাখ আমার ফোনে।"

সামান্য ঝুঁকল টুপুর। মাসির ফোনের মনিটরে পর-পর পাঁচখানা ফোটো। প্রথম ফোটোতে আকাশচাঁদ, আলোকচাঁদের বাবা। পরেরটায় মাথায় পাগড়ি নেই। তারপরেরটায় গোঁফ উধাও। তারপরেরটায় গালের ফোলাভাবটা কম। শেষের ফোটোয় চশমাটাও নেই। কী কাণ্ড, এ তো আহিরচাঁদ! ফোটোশপে একটু কারিকুরি করতেই মিলটা চলে এসেছে। এই জন্যই মাসি কাল বারবার বলছিল, ছবির মানুষটাকে টুপুর চেনে, অথচ টুপুর বুঝতেই পারেনি। নাহ, টুপুর মোটেই মাসির থার্ড আইয়ে কাজ করার যোগ্য নয়।

ব্যস্ত মানুষ অনিশ্চয় মজুমদার ঘড়ি দেখছেন। গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, "কি প্রজ্ঞাপারমিতাম্যাডাম, এবার স্টার্ট করলেই তো হয়।"

অনিশ্চয়ের ভরাট গলায় পুরো নামটা উচ্চারিত হতেই মিতিন টানটান। হাতের কাগজটায় আলগা দৃষ্টি বুলিয়ে বলল, "আমার কাহিনির শুরু একটা বাচ্চা মেয়ের স্বপ্ন থেকে। তারও আগে প্রশ্ন থাকে, মেয়েটি, আই মিন শালিনী, ওই স্বপ্নটি দেখল কেন?"

অনিশ্চয় বললেন, "স্বপ্ন দেখার নির্দিষ্ট কারণ থাকে নাকি?"

"থাকে তো বটেই, তবে সর্বদা আমরা বুঝে উঠতে পারি না। আসলে স্বপ্ন ব্যাপারটা কী? আমাদের মনেরই একধরনের ক্রিয়াকলাপ, যা ঘুমের ভিতরে চালু হয়। মানুষের মগজই সেটা চালায়, কন্ট্রোল করে। আর আমাদের মগজ এক অসামান্য কম্পিউটার। আমাদের জন্মের মুহূর্ত থেকে সে আপনাআপনি অন হয়ে যায়। তারপর থেকে অবিরাম চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। এর মেমারির কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। প্রতিটা মুহূর্তে আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয় যা কিছু দ্যাখে, শোনে, ফিল করে, সবই এর অসীম ভাণ্ডারে জমা হয় এবং তার কণামাত্র পুরোপুরি ডিলিট হয় না। বড়জোর রিসাইকেল বিনে জমা থাকে। স্বপ্ন অনেক সময়েই ওই রিসাইকেল বিন থেকে উঠে আসা স্মৃতি, জেগে থাকা অবস্থায় যা আমাদের মনেই নেই। অনেক সময় অবশ্য সরাসরি স্মৃতিটা আসে না, তখন কিছুই হয়তো নানান উদ্ভট চেহারায় ফিরে আসে। আবার কখনও বা জমা থাকা মেমারি অবিকল সেই চেহারাতেও স্বপ্নে দেখা দেয়।

এবার পার্থ উসখুস করে উঠল, "তোমার লেকচারটা বেশ ইন্টারেস্টিং, কিন্তু ধরতাই হিসেবে খুব লম্বা হয়ে যাচ্ছে না?"

আলোকচাঁদও বললেন, "হ্যাঁ ম্যাডাম, কাটছাঁট করুন। মূর্তির কেসটায় আসুন।"

মিতিন স্মিতমুখে বলল, "আপনার ভাইঝির স্বপ্ন আর মূর্তি হাপিশ হওয়া, দুটোই কিন্তু এক কেসের দু'পিঠ।"

আলোকচাঁদ অবাক সুরে বললেন, "মানে?"

"আপনার ভাইঝি স্বপ্নটি না দেখলে মূর্তিটি খোয়া যেত না। আবার মূর্তিটি না গায়েব হলে স্বপ্নটার অর্থ উদ্ধার করা যেত কিনা সন্দেহ।"

আকাশ-আলোক-আহির মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। আহিরচাঁদই বললেন, "বেশ, আপনার ভাষণই শুনি তবে।"

মিতিন শান্ত ভাবে বলল, "না, আপনাদের আর বিরক্ত করব না। স্বপ্নটা আপনাদের কারও অজানা নয়। শুধু বলি, স্বপ্নের উৎসটি আকস্মিক।"

"কীরকম?"

"আকাশজি-আলোকজি আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, আপনার চাচাজির সঙ্গে আপনাদের বাবার বেশ মিল। অন্তত খুব ছেলেবেলায় শালিনী তার দাদুকে যেমনটা দেখেছিল, সেই চেহারাটা এখনকার আহিরচাঁদজির সঙ্গে অনেকটাই মেলে। আমি কি ভুল বলছি, আকাশচাঁদজি?"

একটু চমকেই কাকার দিকে তাকালেন আকাশচাঁদ। তাঁর মুখে ক্রমশ একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল। দু'দিকে ঘাড় দুলিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, তাই তো। চাচাজিকে শেষ বয়সের পিতাজির মতোই লাগছে বটে। কিন্তু তখন তো আমার শালু এত্তুকুন। ভাল করে কথাও ফোটেনি।"

"একদম ঠিক," মিতিন সায় দিল, "কিন্তু ওর মগজের গুহায় দাদাজির ছবিটা রয়েই গিয়েছিল।"

"আহিরচাঁদের মুখখানা শালিনীর অজান্তে উসকে দিল সেই আবছা স্মৃতি। তার সঙ্গে এই বাড়িটার পুরনো কিছু গল্প। আহিরচাঁদজি যা শুনিয়েছিলেন শালিনীকে। সব মিলেমিশে খুব বাচ্চাবেলায়, প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় এবাড়িতে দাদুকে যেমনটি দেখেছিল, সেটাই ফিরে এল স্বপ্নে। কিন্তু দুঃস্বপ্ন হয়ে।"

"কেন? দুঃস্বপ্ন কেন?" টুপুরের পাশে বলা শালিনীর মুখ দিয়ে আচমকা প্রশ্ন ঠিকরে এল, "দাদাজি নিশ্চয়ই আমাকে খুব ভালবাসতেন, আদর করতেন। তাঁর মেমারি অমন ভয় দেখানো হবে কেন?"

"স্বপ্নটা স্মরণ করো, ওখানেও তিনি তোমাকে আদরই করছিলেন। যেমন দাদাজিরা করেন নাতি-নাতনিদের। কিন্তু স্মৃতি সামান্য বেঁকেচুরে গিয়ে তোমাকে ভীষণ ঘাবড়ে দিয়েছিল।"

"কিন্তু এর মধ্যে পার্শ্বনাথজির মূর্তিটা কোথায়?" ফের আলোকচাঁদের গলা বেজে উঠেছে, "আপনি এইমাত্র বললেন না স্বপ্নের জন্যই চুরি..."

"হ্যাঁ, আলোকচাঁদজি। আমি এখনও তাই বলছি," মিতিন শান্ত, "তবে সেজন্য আহিরচাঁদজিকে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করা প্রয়োজন।"

"যাঃ বাবা, আমি কী করলাম?"

"সেই প্রসঙ্গেই তো আসছি," মিতিনের ঠোঁটে একচিলতে হাসি উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল, "আপনি অল্পবয়সে গৃহত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু কিছুদিন ধরেই কলকাতায় ফিরে আশার জন্য ছটফট করছিলেন। তার কারণও ছিল। আপনি নেতার আসনে থাকতে ভালবাসেন, কিন্তু কিছুতেই রনকপুরের আশ্রমটির কর্তৃত্ব পাচ্ছিলেন না। আমার কথা অস্বীকার করতে পারেন, আহিরচাঁদজি? খবরটা কিন্তু পাক্কা, খোদ রনকপুর থেকে পাওয়া।"

আহিরচাঁদ নীরস গলায় বললেন, "মারোয়াড়িই হই বা রাজস্থানি, বাংলাই আমার দেশঘর সব কিছু। সেখানে ফিরতে চাওয়াটা কি দোষের?"

"একেবারেই না। বরং বাংলাকে, কলকাতাকে, ভালবাসা তো আপনাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। নয়-নয় করে প্রায় তিনশো বছর আপনাদের পরিবার আছেন এরাজ্যে। সেই সুবাদে আপনারা তো আমাদের অনেকের চেয়েই বেশি বাঙালি।"

"তা হলে খামোকা রনকপুরের কথা পাড়ছেন কেন?"

"একেবারে অকারণে নয় গুরুজি। ওখান থেকেই আপনার ফেরার প্ল্যান শুরু হয়েছিল কিনা।"

"কী বলছেন? নিজের শহরে আসব, তার জন্য প্ল্যান লাগে নাকি?"

"আপনি তো একজন সাধারণ জৈন সাধু হয়ে বাকি জীবনটা কাটাতে চাননি। একটু বিশেষ মর্যাদার আসন চেয়েছিলেন আপনি। তার জন্য এগিয়েছেন ধাপে-ধাপে।"

"তাই বুঝি? আপনি সব জেনে ফেলেছেন দেখছি?"

আহিরচাঁদের শ্লেষ গায়ে মাখল না মিতিন। ঠান্ডা গলায় বলল, "আপনার দুই ভাইপোর রনকপুরে যাতায়াত আছে, প্রথমে তাঁদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য পার্শ্বনাথজির কাহিনিটা বাতাসে ভাসিয়ে দিলেন। মানে, আপনার কাছে ওই মূর্তিটা আছে, আপনি সেটি ভাইপোদের হাতে তুলে দিতে চান, এইসব।"

"হ্যাঁ, তাই তো চেয়েছিলাম। এখনও চাই।"

"দাঁড়ান, আমি সবটা বলে নিই। এর পর আপনি নামলেন ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসিতে। শুধু ছোট ভাইপোকে বললেন সেই কাহিনিটা, যা বিশ্বাস করে আপনার বড় ভাই দীপচাঁদজি শেষজীবনে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।"

"কোন কাহিনি? হিরে-জহরত?" আকাশচাঁদ প্রায় লাফিয়ে উঠেছেন, "চাচাজির কাছে ফারসিতে যেটা লেখা আছে?"

"গয়না, পাথর, সোনাদানা আদৌ আছে কিনা, অন্য কথা। সেই প্রসঙ্গে পরে আসছি।"

আলোকচাঁদ রাগী চোখে একবার ভাইকে দেখছেন, একবার চাচাজিকে। তাঁর দৃষ্টিটা পড়ে নিয়ে মিতিন বলল, "কিন্তু ওই গুপ্তধনের গাজর নাকের ডগায় ঝুলিয়ে আকাশচাঁদজিকে হাত করে ফেললেন চাচাজি। উদ্দেশ্য, জমিবাড়ির অংশ ফেরত চাওয়ার সময়ে যেন আকাশচাঁদ তাঁর পক্ষে থাকেন। কিন্তু শালিনীর স্বপ্ন যে প্ল্যানটাকেই বদলে দিল।"

"কীভাবে?"

"আহিরচাঁদজি খুবই বুদ্ধিমান মানুষ। পণ্ডিতও। আমি স্বপ্ন সম্পর্কে গোড়ায় যা-যা বললাম, সবই ওঁর জানা। স্বপ্নটা শোনামাত্র উনি বুঝে গেলেন, ওই দেওয়াল ফাঁক হয়ে যাওয়াটা কোনও অলীক ঘটনা নয়। ঘোরতর বাস্তব এবং ওই দেওয়ালের ওপারেই সন্ধান মিলতে পারে গুপ্তধনের।"

"তাই পাঁচকান করতে মানা করেছিলেন?" টুপুরের মুখ দিয়ে প্রশ্নটা বেরিয়েই গেল, "যাতে গুপ্তধনের ব্যাপারটা বেশি চাউর না হয়?"

"সেটাই তো স্বাভাবিক। ওই কারণে শালিনীর উপর একগাদা বারণ চাপল। ওদিকে জমিবাড়ির অর্ধেকের বদলে বাড়ির আসল জায়গাটা চেয়ে বসলেন আহিরচাঁদজি। জুড়লেন মন্দির বানানোর বাসনাটা। ব্যস, অমনি আলোকচাঁদজি চটে লাল। মূর্তিটাও কাছছাড়া করছেন না, উলটে এই আবদার, তিনি মানবেনই না। তখন আহিরচাঁদজি আর-একটি মতলব ভাঁজলেন। মূর্তিটাই চুরির নামে ভ্যানিশ হয়ে গেল।"

"মানে?" অনিশ্চয়ের ভাঁটার মতো চোখ দু'খানা ঝলসে উঠল, "চুরিই হয়নি মূর্তি? গোটাটাই সাধুজির নাটক?"

"কিন্তু কেন?" টুপুরের প্রশ্ন, "মিছিমিছি সব্বাইকে ব্যস্ত করে ওঁর কী লাভ?"

"আছে। একটা নয়, দুটো। এক নম্বর, মূর্তি না উদ্ধার হওয়া পর্যন্ত নির্বিবাদে রয়ে যেতে পারবেন কলকাতায় এবং এই বাড়িতে এস্টি নেওয়ার চেষ্টা চালাতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, এটাই বেশি মারাত্মক, আলোকচাঁদকে বাড়ি থেকে হঠানো।"

"তা কী করে সম্ভব?"

"সেইখানেই তো আহিরচাঁদের খেল। আলোকচাঁদ সেদিন বিকেলে আসবেন বলেছিলেন ধর্মশালায়। রোজ দেব-দেব বলেও দিচ্ছেন না, সেদিন তিনি মূর্তি নেবেনই। আকাশকে সঙ্গী করতে ভাইয়ের বাড়ি গেলেন আলোকচাঁদ। চাচাজি ভাইকে শিখিয়ে রেখেছিলেন, যেন সে ওইদিন কোনও ভাবে দাদাকে এড়িয়ে যায়। এবার চুরির পর পুলিশি তদন্ত হলে আলোকচাঁদের ধর্মশালায় আগমন প্রকাশ পাবেই। কোথাও না-কোথাও তাঁর আঙুলের ছাপ মিলবেই। তখন গ্রেফতার হবেন আলোকচাঁদ, সেই অবসরে আকাশকে নিয়ে এবাড়িতে ঢুকে পড়বেন চাচাজি এবং নিশ্চিন্তে খোঁজ চালাবেন গুপ্তধনের।"

"আইব্বাস, নিখুঁত ছক!" পার্থ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "ঝানু ক্রিমিনালদেরও মাথায় আসবে কিনা সন্দেহ!"

"কিন্তু ফেল। আলোকচাঁদ সেদিন গেলেন না ধর্মশালায়।"

"সে যাই হোক, বদমাইশি বুদ্ধিটার তারিফ করব না!"

"ওভাবে ওঁকে অসম্মান কোরো না। আহিরচাঁদজির মূল উদ্দেশ্য কিন্তু মন্দ ছিল না। ধনরত্ন পেলেও উনি তো ভোগ করতেন না। মন্দির গড়তেন। জৈন সন্ত হিসেবে একটা স্থায়ী কীর্তি রচনা করতেন," মিতিন আহিরচাঁদের চোখে চোখ রাখল, "এটাই তো আপনি চেয়েছিলেন, তাই না গুরুজি?"

আহিরচাঁদ নীরব। ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে নামিয়ে নিয়েছেন মাথা।

"তা হলে কি হিরে-জহরত নেই?" আকাশচাঁদের দুরুদুরু জিজ্ঞাসা, "চাচাজির ওই লেখাটায় কিন্তু..."

"ওটা জাল," মিতিনের ঘোষণায় চমকে তাকালেন আহিরচাঁদ। মিতিন তাঁকেই বলল, "হ্যাঁ, ওটা আপনি বানিয়েছেন। একটা পুরনো-পুরনো চেহারাও দিয়েছেন। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেননি।"

আহিরচাঁদের দু'চোখে প্রবল বিস্ময়। মিতিন বলল, "ওই দলিলে এমন কয়েকটা ফ্রেঞ্চ শব্দ রয়েছে, যেগুলো আড়াইশো বছর আগের ফারসিতে ছিলই না। যেমন, লেখার একদম শেষে আছে, মের্সি। অর্থাৎ ধন্যবাদ। এটাও ফ্রেঞ্চ। কিন্তু সবে দেড়শো বছর আগে ঠাঁই পেয়েছে ফারসি ভাষায়। সুতরাং দলিলটি শেঠ ফতেচাঁদের সময়ে লেখাই হয়নি। আপনি ফারসি শিখেছেন বড়জোর তিরিশ বছর আগে, তাই হয়তো অজান্তেই হয়ে গিয়েছে ভুলটা।"

টুপুরের চোখ কপালে। মাসি ফারসি শিখল কবে? নাকি বাবার বন্ধু প্রোফেসর শমিউদ্দিনজেঠুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল? মাসির পক্ষে অসম্ভব নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদিকে আর-এক নাটক। আহিরচাঁদ উঠে দাঁড়িয়েছেন। এক পা, এক পা করে এগোচ্ছেন দরজার দিকে। মিতিনই উঠে গিয়ে থামাল তাঁকে। নরম সুরে বলল, "আপনাকে যে আরও কিছু জানানোর ছিল, গুরুজি।"

আহিরচাঁদ আস্তে-আস্তে মাথা নাড়াচ্ছেন। ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, "কিন্তু আমার যে আর কিছু শোনার নেই।"

"তবু গুপ্তধনের রহস্যের চিরতরে ইতি হোক, এ কি আপনি চান না?"

থমকালেন আহিরচাঁদ। এবার বড় ভাইপো সরব হয়েছেন, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, যেটুকু যা আছে, যদি পাওয়া যায়..."

"চলুন, সবাই মিলেই সন্ধান করি," মিতিন মুচকি হাসল, "যদিও কিস্যু মিলবে না..."

"কেন? কেন? কেন?"

কোরাসে বেজে ওঠা প্রশ্নে কান না দিয়ে মিতিন গটগট করে ঢুকল কালকের ঘরটায়। থামল একটু। এবার এক পা, এক পা করে জগৎ শেঠ ফতেচাঁদের ছবির সামনে। টুর গাইডের ভঙ্গিতে বলল, "আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, শালিনীর স্বপ্নে দ্বিতীয় একজনের কথা বলা হয়েছে...ইনিই সেই দ্বিতীয়জন।"

একসঙ্গে অনেক বিস্ময়ধ্বনি, "তাই বুঝি!"

"ইয়েস," মিতিন হাত বাড়িয়ে ছবির ফ্রেমের খাঁজ থেকে একটা সরু লোহার শলাকা বের করে আনল। শলাকাটি ছোঁয়াল ফতেচাঁদের পাগড়িতে। উঁহু, পাগড়ির রক্তবর্ণ পাথরে। তারপর আচমকাই ডান পা তুলে দিয়েছে দেওয়ালে। শলাকা যেখানে ছবিকে ছুঁয়েছে, তার খাড়া নীচটায়। ঘাড় ঘুরিয়ে গোটা দঙ্গলকে বলল, "মনে রাখুন, শালিনীর স্বপ্নে এটাই লাথি।"

বলেই শলাকা আর পা দিয়ে একসঙ্গে চাপ। অমনি এক বিকট ঘড়ঘড় শব্দ। আওয়াজে কেঁপে উঠেছে সকলে। পরক্ষণে পিলে চমকানো কাণ্ড। ছবিসুদ্ধ আস্ত দেওয়াল দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

মিতিন উঁকি দিল দেওয়ালের ওপারে। তারপর মৃদু হেসে বলল, "সিঁড়ি আছে। যান, সরেজমিন করে আসুন।"

হুড়মুড়িয়ে ছুটেছে সকলে। পাথরের সিঁড়ি ধরে নামছে টুপুরও। বড়ঘরের চিলতে আলো এসে পড়েছে মাটির তলার কুঠরিতে। খোলা সিন্দুক, তামার প্রকাণ্ড জালা রয়েছে বেশ কয়েকটা। সবগুলোই বেবাক ফাঁকা। সোনা-রুপো-হিরে-মুক্তোর একটি কুচিও পড়ে নেই।

একই প্রক্রিয়ায় মিতিন বন্ধ করল দেওয়াল। জুড়ে দিল জগৎ শেঠ ফতেচাঁদের ছবি। অবসন্ন মুখে আবার বসার জায়গায় ফিরেছেন আকাশ-আলোক-আহির।

ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে আলোকচাঁদই বলে উঠলেন, "আশ্চর্য, ধনরত্ন সব উধাও! গেল কোথায়?"

মিতিন কাঁধ ঝাঁকাল, "তা তো জানি না। আপনাদের পূর্বপুরষরাই শেষ করে গিয়েছেন নিশ্চয়ই। হয়তো মন্দির বানিয়েছেন, দানধ্যান করেছেন কিংবা ব্যবসায় খুইয়েছেন। তবে এটা বলতে পারি, গুপ্তকক্ষ আবিষ্কার করেই দীপানাথজির মাথার গোলমাল হয়েছিল। কুঠুরি শূন্য, এই ধাক্কাটা উনি সামলাতে পারেননি।"

"তাই হবে হয়তো," আলোকচাঁদ একটা ওজনদার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। পরের মুহূর্তেই সরু চোখে বললেন, "যাক গে যাক, তার জন্য শোক করাও বোকামি। কিন্তু পার্শ্বনাথজির মূর্তিটার হদিশ মিলবে কি?"

মিতিন মিটিমিটি হাসছে, "আপনি দেখেছেন মূর্তিটা?"

"উঁহু।"

"আকাশচাঁদজি, আপনি?"

"না, চাচাজি বলতেন। তোমাদের হাতেই তো তুলে দেব, একবারেই দেখো। একবার শুধু নজরে পড়েছিল, ওঁর আলমারিতে একটা জিনিস যেন মোড়া আছে কাপড়ে। ওইটাই বোধ হয়..."

"সরি। ওই কাপড়টাই ছিল শুধু। ভিতরে ভোঁভোঁ।"

"মানে?"

"আহিরচাঁদজির কাছে কোনও মূর্তি ছিলই না। সুচারু ভাবে ওই গল্পটা ফেঁদেছিলেন আপনাদের চাচাজি। কলকাতায় পায়ের নীচে শক্তপোক্ত মাটি পাওয়ার আশায়। শালিনীর স্বপ্ন ওঁকে সে সুযোগও করে দিয়েছিল। কিন্তু বিধি বাম, সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল!"

দুই ভাই কটমট চোখে দেখছেন কাকাকে। মিতিন অনিশ্চয়কে বলল, "চলুন, আমরা এবার উঠি। ওঁরাও এখন নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়াগুলো শান্তিতে সারতে পারবেন।"

চারজনে বেরিয়ে আসছে ঘর ছেড়ে, হঠাৎ দৌড়ে এল শালিনী। টিপ করে মিতিনকে প্রণাম করে বলল, "মাসি, ইউ আর আ জিনিয়াস! ইউ আর গ্রেট!"

অনিশ্চয় অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, "যাক, কেসটায় কিছু ফি মিলল তা হলে!"

পার্থও হাসছে। হাসছে টুপুরও।

ওফ, সত্যি, মাসি খেল দেখাল বটে আজ! আচ্ছা, মাসিকে আজ থেকে ভানুমতী বলে ডাকলে কেমন হয়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~